উত্তর বাংলার শিল্পায়নের সমস্যা ও সম্ভাবনা-প্রেক্ষিত নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলা

মোঃ মেহেদী পারভেজ*
মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান

সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় উত্তরবঙ্গ অনগ্রসর অঞ্চল। এই অনগ্রসরতা দূর করার জন্য এই অঞ্চলে দ্রুত শিল্পায়ন করা জরুরী। এখানে রয়েছে বিশাল সস্তা শ্রমশক্তি যা কাজে লাগিয়ে দ্রুত শিল্পায়ন ঘটানো সম্ভব। এখানে প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট সময় (কার্তিক মাস) মঙ্গা দেখা দেয়। তখন মানুষের হাতে কোন কাজ থাকে না। ফলে তাদেরকে অর্ধাহার, অনাহারে দিন কাটাতে হয়। এমন কি খাদ্যাভাবে মৃত্যুবরণ পর্যন্ত করতে হয়েছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য তাদেরকে রিলিফ প্রদান, ঋণ প্রদান কিংবা লংঙ্গরখানা খুলে সাময়িক ভাবে হয়ত কিছু সাহায্য করা যেতে পারে, কিন্তু স্থায়ী সমাধানের জন্য এবং তাদেরকে স্বাবলম্বি করে তোলার জন্য কাজ দিতে হবে। যা শিল্পায়নের মাধ্যমে সম্ভবপর হতে পারে। উত্তরবঙ্গের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা সমগ্র দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিল্পায়ন খুবই জরুরী। এই প্রবন্ধে উত্তরবঙ্গের শিল্পায়নের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং এ সকল সমস্যার সমাধানসহ শিল্পায়নের সম্ভাবনা সম্পর্কে নির্দিষ্ট কিছু সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়েছে।

১। *ভূমিকা*

প্রত্যেকটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমান বিশ্বে শিল্পায়ন ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রায় অসম্ভব। বাংলাদেশ মূলত একটি কৃষি প্রধান দেশ; কিন্তু তা সত্ত্বেও শিল্পের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কারণ, আধুনিক যুগে কোন দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কেবল কৃষির উপর নির্ভর করতে পারে না। বিশ্বের উন্নত দেশ সমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলে রয়েছে দ্রুত শিল্পায়ন। অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও শিল্পের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। ১৯৭২-১৯৭৩ সালে মোট জাতীয় উৎপাদনে কৃষি ও শিল্পের অবদান ছিল যথাক্রমে ৫০ শতাংশ ও ১৪ শতাংশ, ২০০৪-২০০৫ সালে কৃষির অবদান কমেছে ২১.৯১ শতাংশ এবং শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধি বেড়েছে ২৮.৪৪ শতাংশ। দেশের মোট কর্মসংস্থানে কৃষির অবদান ৭৫ শতাংশ থেকে ৪০-৪৫ শতাংশে নেমে এসেছে। ২০০১-২০০২ অর্থবছরে শিল্পখাতে জিডিপি ১৫.৭৬ শতাংশ আর ২০০৪-২০০৫ এ ১৬.৫৮ শতাংশ। ২০০৫ সালে শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৭.৪৮ শতাংশ। দেশের জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি,

* মানব সম্পদ অফিসার (রংপুর) ব্র্যাক এবং অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন, অভ্যন্তরীন চাহিদা পূরণের জন্য,ভোগ্যপণ্য সরবরাহ, কৃষি উন্নয়নের প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, সর্বোপরি দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।

তুলনামূলকভাবে অনগ্রসর উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে শিল্পায়নের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা এবং এসবের সমাধানের উপায় নির্ধারণই হচ্ছে এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু । এককথায় প্রবন্ধটির প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে উত্তরাঞ্চলের জনপদ গুলোতে (সৈয়দপুর) কিভাবে শিল্পায়ন ঘটানো যায় তার পন্থা খুঁজে বের করা । এ মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য সমূহ নির্ধারণ করা হয়েছেঃ

- বাংলাদেশের শিল্পায়নের বর্তমান অবস্থার একটি বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন করা ।
- উত্তরাঞ্চলের শিল্পায়নের সমস্যা গুলো চিহ্নিত করা এবং সমস্যা গুলোর সমাধানের চেষ্টা করা ।
- উত্তরাঞ্চলের শিল্পায়নের সম্ভাবনা গুলিকে কাজে লাগিয়ে দ্রুত শিল্পায়ন করা ।

২। *বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় শিল্পায়ন*

কোন অর্থনীতিতে বা এর কোন খাতে যান্ত্রিক উৎপাদন সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে শিল্পায়ন বলে । শিল্পায়ন দেশের অর্থনীতিতে শিল্পজাত পণ্যের আধিক্য সৃষ্টি করে । শিল্পায়নের প্রক্রিয়ায় একটি দেশ কৃষি প্রধান দেশের নাম ঘুচিয়ে শিল্প প্রধান দেশে রুপান্তরিত হয় । যেমন: অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড । আবার কৃষি-শিল্প প্রধান দেশ থেকে শিল্প-কৃষি প্রধান বা শিল্প প্রধান দেশেও রূপান্তরিত হতে পারে । যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ফ্রান্স ইত্যাদি । অর্থনীতির কোন বিশেষ খাতের, ধরা যাক কৃষি খাতের শিল্পায়নের অর্থ হচ্ছে খাতটিকে শিল্প বা যান্ত্রিক ভিত্তির উপর দাঁড় করানো । তবে বিভিন্ন ধরনের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় শিল্পায়নের লক্ষ্য, এর প্রকৃতি, গতি, ফলাফল ইত্যাদি ও বিভিন্ন হয়ে থাকে । পুঁজিবাদী শিল্পায়ন শুরু হয় গ্রেট বৃটেনে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে । কতগুলো উপাদান ঐ দেশটিতে শিল্প বিপ্লব ঘটাতে সাহায্য করেছিল । প্রথমত: বৃটিশরা ইতোমধ্যেই বিশাল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য কায়েম করে ছিল । উত্তরের কানাডা থেকে দক্ষিণের অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এ সাম্রাজ্য । উপনিবেশগুলো লুণ্ঠনের মাধ্যমে তারা সম্পদশালী হয়েছিল । এগুলোকে তারা বাজার এবং খাদ্য ও কাঁচামালের উৎস হিসেবে ব্যবহার করেছিল । দ্বিতীয়তঃ ঐ সময়ে দেশটিতে প্রযুক্তিগত বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল । আর্করাইটের স্পিনিং মেশিন, জেমস ওয়াটের বাষ্পীয় ইঞ্জিন, হারগ্রিভসের ওয়েভিং মেশিনসহ বেশ কিছু আবিষ্কার হস্তচালিত উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে বৃহৎ যন্ত্রচালিত উৎপাদন ব্যবস্থায় উত্তরণ ঘটাতে সাহায্য করেছিল । আর এর অর্থ এই যে, প্রযুক্তিগত বিপ্লব পরবর্তীতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু নাগাদ বৃটেনে শিল্প বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিল । পরবর্তীতে ইউরোপের অন্যান্য দেশও শিল্প বিপ্লব ছড়িয়ে পড়েছিল ।

শিল্প বিপ্লবের প্রক্রিয়া শেষ হয়েছিল মেশিন উৎপাদনের জন্য মেশিন ব্যবহারের মধ্য দিয়ে । বৃহৎ শিল্প অর্থনীতির সকল খাতে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল । ধ্বংস করেছিল পণ্য উৎপাদনের সেকেলে পদ্ধতি । ফলে উৎপাদনের আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছিল বহুগুণে । শুরু হয়েছিল উৎপাদনের ঘনীভবন প্রক্রিয়া । শিল্পায়ন প্রক্রিয়া শুধুমাত্র শিল্প উৎপাদনকেই প্রভাবিত করেনি, অর্থনীতির অন্যান্য খাতের উপরও এর প্রভাব দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল । প্রথমে এর প্রভাব পড়েছিল কৃষি ও পরিবহনের উপর । কৃষি শিল্পের ক্রমবর্ধমান কাঁচামালের চাহিদা পুরণ করতে থাকে এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য

যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক সার এবং অন্যান্য শিল্পজাত পণ্যের ব্যবহারকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়। অন্যদিকে পণ্য পরিবহনের প্রধান মাধ্যম হিসেবে আবির্ভূত হয় রেললাইন। আর রেলপথের উন্নয়ন নির্ভরশীল ছিল জ্বালানী ও ধাতুর উৎপাদনের উপর। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, শিল্পায়ন প্রক্রিয়া ক্রমান্বয়ে অন্যান্য খাতের আধুনিকায়ন ও বিকাশ কে ত্বরান্বিত করেছিল। এ কঠিন অথচ পরস্পর নির্ভরশীল প্রক্রিয়ায় মূখ্য ভূমিকা পালন করে বৃহৎ শিল্প।

পুঁজিবাদের নিয়মানুযায়ী শিল্পায়ন শুরু হয়েছিল হালকা শিল্পের যান্ত্রিকীকরনের মাধ্যমে। এর কারণ হচ্ছে: হালকা শিল্পে কম পুঁজি লাগে এবং পুঁজির আবর্তনে কম সময় লাগে। ফলে মূলধন গঠন প্রক্রিয়া দ্রুততর হয় এবং হালকা শিল্পের মেশিনসহ উৎপাদনের উপকরণের চাহিদাও দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। এ পর্যায়ে আবির্ভাব ঘটে ভারী মৌলিক শিল্পের যা ক্রমান্বয়ে নেতৃত্বদানকারী শিল্পে পরিণত হয়। শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় সকল পুঁজিবাদী দেশে দ্রুত গতিতে বিকশিত হতে থাকে মৌলিক ভারী শিল্পের। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, জার্মানীতে ১৮৬৭-১৯১৩ এ সময়ে উৎপাদনের উপকরনের (মূলধনী পণ্যের) উৎপাদন ৯ গুন বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন ঐ একই সময়ে মাত্র ৪ গুণ হয়েছিল। অন্যদিকে ফ্রান্সের মৌলিক ভারী শিল্প হালকা শিল্পকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ-ষাটের দশকেই।

ঐতিহাসিকভাবে পুঁজিবাদী শিল্পায়ন অবশ্যই প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছে। শিল্পায়নের ফলে পুঁজিবাদী দেশগুলোর অর্থনীতিতে শিল্প প্রধান খাত হিসেবে আবির্ভূত হয়। অর্থনীতির আধুনিকায়ন সম্ভব হয়। শ্রমের উৎপাদনশীলতা বহুগুনে বৃদ্ধি পায়। নগরায়ন বৃদ্ধি পায় এবং গড়ে উঠে বড় বড় শিল্প কেন্দ্র। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় শিল্পায়নের যে ধারা তা কেবল মাত্র গুটি কয়েক দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: গ্রেট বৃটেন (তার ডোমিনিয়ন কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকাসহ), জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালী, অস্ট্রিয়া, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র। ঐতিহাসিকভাবে দেখলে দেখা যাবে যে, এদের সবাই কলোনীর মালিক ছিল। জোর করে অন্য দেশ দখল করে উপনিবেশ বানিয়েছিল। উপনিবেশগুলোকে তারা মেট্রোপলির বিকাশমান শিল্পের বাজার ও কাঁচামালের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছিল। শুধু তাই নয়, এগুলো লুণ্ঠনের মাধ্যমে তারা মেট্রোপলির সঞ্চয় বাড়াতে সক্ষম হয়েছিল। এভাবেই উপরোক্ত দেশগুলো নিজেরদের দেশকে শিল্পায়িত করতে সক্ষম হয়েছিল। আর এশিয়া, আফ্রিকা ও লেটিন আমেরিকাসহ পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে অবস্থিত তাদের কলোনীগুলো মেট্রোপলির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং কৃষিজাত পণ্য ও খনিজ সম্পদের যোগান দাতায় পরিণত হয়। শিল্পায়িত দেশগুলোর শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী নিয়মে অসমতা ও বৈষম্য দেখা দিয়েছিল। গুটিকয়েক সাম্রাজ্যবাদী দেশ বিশেষ কতগুলো শিল্পে একচেটিয়া শক্তিধর দেশে পরিণত হয় এবং বিশ্বের শিল্পোৎপাদনের সিংহভাগ তাদের নিয়ন্ত্রনে রাখতে সক্ষম হয়। উদাহরণ স্বরূপ চারটি দেশের কথা বলা যায়ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেটবৃটেন, ফ্রান্স ও জার্মানী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (১৯৩৫-৪৫) প্রাক্কালে পুঁজিবাদী বিশ্বের শিল্পোৎদনের ৭০% এরও বেশী উৎপাদন করতো অথচ পুঁজিবাদী বিশ্বে তাদের সম্মিলিত আয়তন ও লোকসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৮% ও ১৫% মাত্র। এদের সাথে বর্তমানে পুঁজিবাদী বিশ্ব এখন মূলতঃ তিনটি কেন্দ্রে বিভক্ত হয়ে পড়েছেঃ জাপন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন ঘটেছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে। পুঁজিবাদী শিল্পায়ন হয়েছিল ব্যক্তিগত উদ্যোগে, ব্যক্তিগত মালিকানায়। আর সামাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন ঘটেছে সামাজিক মালিকানায়,

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে। ১৯১৭ সালের ২৫শে অক্টোবর বিপ্লবের মাধ্যমে রাশিয়ায় প্রথম সমাজতন্ত্রের জন্ম হয়। এ শিল্পায়ন ছিল সম্পূর্ণ ভাবে নিজস্ব সম্পদ নির্ভর। সমাজতন্ত্রের নিয়মানুযায়ী তারা মৌলিক ভারী শিল্পের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছিল। কারন মৌলিক ভারী শিল্প সমাজতন্ত্র তথা অর্থনীতির ভিত্তি নির্মানে সাহায্য করে। পুঁজিবাদে শিল্পায়ন ঘটেছিল অপরিকল্পিতভাবে, আর সমাজতন্ত্রে পরিকল্পিত ভাবে। রাশিয়ায় ১০ থেকে ২০ বছর মেয়াদী গোএলরো পরিকল্পনা ঘোষনা করা হয় যাতে মৌলিক ভারী শিল্পের উপর বিশেষ করে সমগ্র দেশের বিদ্যুতায়নের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। এ পরিকল্পনায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ৩০টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল। আর এটা বাস্তবায়ন করতে গিয়েই গড়ে তুলতে হয়েছিল অন্যান্য সব মৌলিক ভারী শিল্প: খনিজ পদার্থ উত্তোলনের শিল্প (কয়লা, আকরিক লৌহ, অন্যান্য খনিজ ধাতব পাদার্থ, তেল ও গ্যাস), লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, যন্ত্রপাতি শিল্প ইত্যাদি। আর এগুলোর উপর ভিত্তি করেই বিকশিত হয়েছিল অর্থনীতির অন্যান্য খাত ও উপখাত গুলো। এ পরিকল্পনা মূলতঃ বাস্তবায়িত হয়েছিল পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে। ১৯২৮ সালে প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ঘোষনা করা হয় যার মেয়াদ ছিল ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত। সোভিয়েত ইউনিয়ন অত্যন্ত সফলতার সাথে প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে। ফলে তারা পরবর্তীতে দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন শুরু করে ১৯৩৩ সালে। এ পরিকল্পনার মেয়াদকাল ছিল ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত।

প্রথম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনাকালে ১,৫০০টি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মান করা হয় যার বেশির ভাগই ছিল মৌলিক ভারী শিল্প। এ পরিকল্পনার শেষে দেশের শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুন হয়েছিল এবং উৎপাদনের উপকরনের উৎপাদন প্রায় তিনগুন হয়েছিল (২.৭ গুন)। শিল্পোৎপাদনের বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ২৯.২% আর মূলধনী পণ্যে প্রবৃদ্ধি হয় ২৮.৫%। অপরদিকে দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পানাকালে প্রতিষ্ঠা করা হয় ৪,৫০০ বৃহৎ শিল্প কারখানা। এ পরিকল্পনাকালে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ২.২ গুন হয় আর মূলধনী পণ্যে ২.৪ গুন। বিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ২.৭ গুন। সম্পন্ন হয় গোএলরো পরিকল্পনার বাস্তবায়নের কাজ। দেশে ৩০টির স্থলে ৪২টি বৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মান করা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন আবির্ভূত হয় একটি শিল্পায়িত দেশ হিসেবে। সারা বিশ্বের শিল্পোৎপাদনে দেশটি ১৯১৩ সালের ৫ম স্থান থেকে ২য় স্থানে উঠে আসে (যুক্তরাষ্ট্র ছিল ১ম স্থানে)। অর্থনীতির কাঠামোতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়ঃ শিল্পের অংশ দাঁড়ায় ৭৭.৪%, আর কৃষির ২২.৬%।

চীনসহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর শিল্পায়নে সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তা কম সময় লেগেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্পায়নে সেখানে দু'দশক সময় লেগেছিল, চীনসহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে সেখানে মাত্র এক দশকের মত সময় লেগেছিল। আর পুঁজিবাদী দেশ গুলোতে লেগেছিল ১০০ থেকে ২০০ বছরের মত।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিল্পায়ন অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু শত শত বছরের ঐপনিবেশিক শাসন ও শোষনের ফলে তাদের অর্থনীতির মেরুদন্ড ভেঙ্গে গিয়েছে। একদিকে সম্পদের অপ্রতুলতা, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর অনুসৃত নব্য সাম্রাজ্যবাদীনীতির কারণে এ সকল দেশের শিল্পায়নসহ আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের প্রচেষ্ট পদে পদে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। স্বাভাবিক কারনেই এ সকল দেশের সমস্যা অনেক। কর্মসংস্থানের সমস্যা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সমস্যা, সঞ্চয়ের স্বল্পতা, আবাসনের সমস্যা, স্বাস্থ্য সমস্যা, খাদ্য সমস্যা ইত্যাদি। এমতাবস্থায় এ সকল দেশের দ্রুত শিল্পায়ন আবশ্যক। আর সেজন্য প্রয়োজন উন্নত দেশসমূহের সাহায্য সহযোগিতা।

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো এবং তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সংস্থাগুলো (বিশ্ব ব্যাংক, আই. এম. এফ. এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক ইত্যাদি) সাহায্য সহযোগিতার ক্ষেত্রে নানা শর্ত জুড়ে দেয়। তারা নিজেদের দেশে দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থ বিবেচনায় রেখে সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে থাকে। নিকট অতীতের উপনিবেশ গুলোকে ছলে-বলে-কৌশলে নিজেদ প্রভাব বলয়ে ধরে রাখা, তাদের প্রাকৃতিক সম্পদকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করা এবং এদেশ গুলোকে বাজার হিসেবে ব্যবহার করা এসবই হচ্ছে তথাকথিত সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে আজ পর্যন্ত কোন দেশ আত্মনির্ভরশীল হতে পারেনি, পারেনি নিজের দেশকে শিল্পায়িত করতে।

সাম্রজ্যবাদী সাহায্যের টোপ গিলে এ সকল দেশ গুলোর অধিকাংশই বর্তমানে বিশাল ঋণের বোঝায় জর্জড়িত। ঋণের সুদ পরিশোধ করতেই তাদের জাতীয় আয়ের সিংহভাগ খরচ করতে হচ্ছে। শিল্পায়ন তাদের জন্য স্বপ্নই থেকে যাচ্ছে। বাংলাদেশের বাজেটের শতকরা ১৮ ভাগ ঋণ পরিশোধ করতে চলে যায়। তারা বাংলাদেশেরকে ঋণ দানের কথা বলে গ্যাস রপ্তানি করতে বলে। অথচ গ্যাসে আমরাই স্বয়ংসম্পূর্ণ নই। আমাদের দেশের শিল্পায়ন অনেকাংশেই গ্যাসের উপর নির্ভরশীল। কারণ গ্যাসই আমাদের একমাত্র জ্বালানী সম্পদ। তাই দাতা দেশ গুলির সাহায্যের দিকে তাকিয়ে না থেকে এবং তাদের কুপরামর্শকে এড়িয়ে চলে, আমাদের দেশে শিল্পায়নের জন্য সঠিক ও দক্ষ পরিকল্পনা দরকার।

২.১ *উত্তরাঞ্চলের শিল্পায়নের ঐতিহাসিক পটভূমি*

এটা সত্য যে, ভারত উপমহাদেশের এ অঞ্চলে ১৯৪৭ সালের পূর্বে তেমন কোন শিল্প ছিলনা। তখন বড় মাপের যে দু'টো শিল্প ছিল তার একটি হলো মিহি চিনি তৈরির কারখানা গোপালপুর (বর্তমানে নাটোরে) এবং সেতাবগঞ্জ (বর্তমানে ঠাকুরগাঁতে)। এই দুটি প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিমালিকানায় ১৯৩৩-৩৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই দু'টি বাদে এই এলাকায় শিল্প বলতে শুধু ছিল কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প।

রাজশাহীতে মুঘল আমলে সনাতন পদ্ধতিতে সিল্কের কাঁচামাল ও সিল্ক পন্য উৎপাদন হতো। সিল্ক শিল্প তখন এখানে বহালতবিয়াতে ছিল। বৃটিশ আমলে বাংলাকে বলা হত ইন্ডিয়ান সিল্ক ভান্ডার, রাজশাহী ছিল সিল্ক উৎপাদনে অন্যতম এলাকা। রাজশাহীর সিল্ক পন্য ছিল খুবই উন্নত মানের।

১৮ শতকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দুটি সিল্ক কারখানা নিয়ন্ত্রণ করতো যার একটি ছিল রাজশাহীতে এবং অপরটি রাজশাহী থেকে প্রায় ১৬ মাইল দূরে, সারদায়। ১৮৩০ সালে সিল্কের খুব খ্যাতি ছিল এবং নবাবরা সিল্ক পরিধান করত। মটকা রাজশাহীর তাঁতিরা তৈরি করে ছিল যা এখনও পাওয়া যায়। রাজশাহীর বিভিন্ন থানা হতে মটকা জোগাড় করা হত। মটকা- হলো বিশেষ ধরনের সিল্ক কাপড় যা দিয়ে পাঞ্জাবি ও সার্ট তৈরি হয়।

১৮৭১ সালে নন্দপাড়ার কাছে বগুড়ার একটি সিল্ক কারখানা গড়ে উঠেছিল। ১৮৬৮ সালের দিকে উন্নত মানের সিল্ক বগুড়ার স্থানীয় লোকরা তৈরি করত। বিশেষ করে পার্শ্ববর্তী শাহজাদপুর এবং গন্ডগ্রামে তৈরি হত। রাজশাহী ও মুর্শিদাবাদে সিল্ক সুতার রীলের সিংহভাগ আসত বগুড়া থেকে। ১৯ শতকের শেষের দিকে রাজশাহী এবং বগুড়ায় সিল্ক শিল্প শুরু হয়। তখন এখানকার সিল্ককে অন্যান্য দেশ যেমন চীন, ফ্রান্স, ইতালি ইত্যাদি দেশ গুলোর সাথে প্রতিযোগিতা করতে হত। পরবর্তীতে গুটি পোকার রোগ সিল্ক শিল্পকে ধ্বংস করে এবং এ শিল্প ধ্বংস হওয়ার আর একটি বড় কারণ হল তখন নীল চাষ বৃটিশদের কাছে সিল্ক এর চেয়ে বেশী লাভজনক ছিল। ফলে তারা সিল্ক বাদ দিয়ে নীল চাষ শুরু করে।

চিনি শিল্প উত্তর বাংলাদেশের অন্যতম পুরাতন শিল্প। তখন বদলগাছির (নওগাঁ) চিনি ছিল উন্নত মানের। ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশ হতে মারোয়াড়ীরা এসময় মিহি চিনি আমদানি করা শুরু করলে এই শিল্প প্রতিকূলতার মধ্যে পড়ে। ১৮৭৫ সালে একটি চিনি শোধানাগার দমদমে চালুকরা হয়, যা রাজশাহী ও মুর্শিদাবাদে রপ্তানি করা হত। ইউরোপীয়ান কোম্পানী লাক্সমানহাটে (পূর্বে রাজশাহীতে বর্তমানে নাটোরে অবস্থিত) চিনি রাখার গুদাম করা হয়েছিল। কাঁচা চিনি ও ঝোলাগুড় সাবেক দিনাজপুর, রংপুর ও পাবনা জেলায় তৈরি করা হত, তবে তা রাজশাহী ও বগুড়ার তুলনায় অল্প পরিমানে উৎপাদন হত।

১৯ শতকের শেষের দিকে সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর এবং বগুড়ার মাঝিরাতে বিভিন্ন ধরনের কাগজ তৈরি হত। তখন কাগজ তৈরির কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হত পাট, লাইশ (সিমেন্ট তৈরির জন্য চুনাপাথর পুড়িয়ে সে পদার্থ পাওয়া যায়), পানি এবং আতবচালের পেষ্ট। ১৯ শতকের এবং বিংশ শতকের শুরুর দিকে পাবনা, রংপুর ও দিনাজপুর জেলায় হাতে তৈরি কিছু কাগজও তৈরি হত।

উত্তর বাংলাদেশে বিশেষ করে পাবনা এবং বগুড়াতে বিংশ শতাব্দির প্রথম দিকে অন্যতম শিল্প ছিল হস্ত তাঁত এবং বয়ন শিল্প। পূর্বে বগুড়া জেলায় বয়ন শিল্পের মধ্যে ছিল ধুতি, চাদর, রুমাল, থান- কাপড়, সিল্ক ও মোটা কাপড় ইত্যাদি বস্ত্র। পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলার বয়ন শিল্পের মধ্যে ছিল তুলার মোটা শাড়ি, গামছা, হোসিয়ারি, তোয়ালা ইত্যাদি। স্থনীয় পোতা নামে কতিপয় মোটা কাপড় ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গি এবং দিনাজপুর জেলার চিরিবন্দর উপজেলায় চাষিরা পাট ও তুলা দিয়ে তৈরি করত। ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গি এবং পঞ্চগড় জেলার আটোয়ারী উপজেলায় পাটের তৈরি মোটা চটকাপড় বিপুল পরিমানে তৈরি হত যা কলকাতায় রপ্তানি করা হত।

সমস্ত উত্তরবঙ্গে পিতল ও কাঁসার জিনিস তৈরি হত। বিশেষ করে প্রাক্তন রাজশাহী জেলায় বেশী তৈরি হত। বিংশ শতাব্দির শুরুর দিকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোরজেলার কালামে, বগুড়াজেলার শেরপুর, পাবনাজেলার চাটমহর ও মুলাডুলি এবং সিরাজগঞ্জে শিল্পটি ব্যাপক আকারে বিস্তৃতি লাভ করে। এগুলো দ্বারা গৃহ-সরঞ্জাম তৈরি করা হত। রাজশাহী কামার শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল এবং কামার শিল্পগুলি গড়ে উঠে ছিল গ্রাম এবং সাপ্তাহিক বাজারগুলোতে। ১৯০৭ সালে এখানে ৬৫০ টির মত কামার কারখানা ছিল সেখানে ৩৫০০ জন শ্রমিক কাজ করত। কিন্তু ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের ফলে কামাররা ভারতে চলে যায় ফলে এই শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হওয়ার পর ভারতের বেনারস থেকে এদেশে লোক আসে, এবং তারা পাবনার ঈশ্বরদী, নীলফামারীর সৈয়দপুরে এবং ঢাকার মিরপুরে আস্তানা গড়ে। তারা ছিল বেনারস শাড়ি তৈরিতে পারদর্শী। ফলে তারা এ অঞ্চল গুলোতে বেনারস শাড়ি তৈরি করতে শুরু করে। বেনারস শাড়ি ছিল উন্নত মানের শাড়ি যা সাধারণত বিয়ের শাড়ি হিসোবে ব্যবহৃত হত।

যাহোক, তখন যে অল্প পরিসরে শিল্প উৎপাদন হত, তা প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই অপ্রতুল ছিলো। বস্ত্র চাহিদার সিংহভাগ মিটতো হস্তচালিত তাঁত শিল্পের উৎপাদন দিয়ে। তাছাড়া ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে কাপড় আমদানিও হতো। কুটির শিল্প অপেক্ষাকৃত উন্নত ছিলো। সব কিছু মিলিয়ে তদানীন্তন বাংলাদেশের শিল্প ভিত্তি দুর্বল ছিলো। বিশ্ব ব্যাংকের এক হিসেব অনুযায়ী ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের মাত্র ৪ ভাগ আসতো শিল্প খাত থেকে।

২.২ *১৯৪৭-১৯৭১ সাল পর্যন্ড় উত্তরাঞ্চলের শিল্পায়নের অবস্থা*

দু'শত বছর বৃটিশদের শোষনের ফলে মধ্য ঊনিশ শতকে যে শিল্প বিপ্লবের হাওয়া বইতেছিল তা বাংলাদেশকে প্রভাবিত করতে পারেনি। ফলে উত্তরবঙ্গেতেও শিল্পায়ন হয়নি। কিন্তু অল্পদিনে অবস্থার পরিবর্তন আসে। কারণ বাংলাদেশ ছিল পাট শিল্পের জন্য অসাধারণ সম্ভাবনাময় এলাকা। তখন এখানে কাঁচা পাটই প্রধানত উৎপাদন হত। বৃটিশ সরকার বাংলাদেশে শিল্প স্থাপনের বিপরীতে ইংল্যান্ডের ডান্ডি এবং ম্যানচেস্টারে পাট শিল্প স্থাপন করে। এটি সরল সাক্ষ্যপ্রমান দেয় যে, বৃটিশ সরকার তাদের নিজের স্বার্থে কেবল এই সম্পদ ব্যবহার করত এবং এমনকি তারা এখানকার আদিবাসীদের এই সম্পদের ভাগ দিতে ইচ্ছুক ছিল না।

বাস্তবে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এখানে কোন শিল্পনীতি ছিল না। পাকিস্তান সৃস্টির পর বাংলাদেশ পূর্ব পাকিস্তান হিসাবে আবির্ভাব ঘটে। যা ছিল প্রাথমিক পণ্য উৎপাদনকারী এলাকা। এ সময় এখানে মূলত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ছিল। এখানে অল্প সংখ্যক বৃহৎমাত্রায় শিল্প ছিল। যেমন কয়েকটি টেক্সটাইল মিল, কিছু সংখ্যক চিনি মিল, একটি সিমেন্ট কারখানা এবং কিছু সংখ্যক পাটের বেইল তৈরি কারখানা। চিনিশিল্প ছাড়া অন্যান্য শিল্প উত্তরবঙ্গে তেমন গড়ে উঠেনি। ১৯৪৯-১৯৫০ সালে সমস্ত পূর্বপাকিস্তানের মোট দেশজ উৎপাদনের মধ্যে শিল্পের অবদান ছিল ৩ শতাংশ এবং যার অর্ধেকের বেশী আসত পাট থেকে। তখন উত্তরবঙ্গের শিল্পের ক্ষেত্রে অবদান ছিল গুরুত্বহীন। পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর শিল্পায়নকে ব্যক্তিমালিকানায় নিয়ে আসা হয়। কিন্তু প্রথম দিকে এটা তেমন কোন সাড়া পায়নি। এসময় প ব
পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলে শিল্পায়নের অবস্থা শোচনীয় ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পায়নের শুরু হয় পাট উৎপাদনের মধ্য দিয়ে। ১৯৪৯ সালে সরকার তিনটি ব্যক্তিগত উৎপাদন একক সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় আনুষ্ঠানিক ভাবে অনুমোদন করার পরিকল্পনা নেয়। পূর্ব পাকিস্তানের কেন্দ্র ঢাকা এবং নারায়নগঞ্জ এ পাটকল স্থাপন করেছিল। ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসের পর সরকারের শিল্পায়নের নীতি পরবর্তী দুই শতক একই রকম থাকে। যার ফলে শিল্পায়ন ব্যক্তিমালিকানার দিকে ধাবিত হয়।

১৯৪৯ সালে সরকার পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিন্যান্স কর্পোরেশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে, যা ব্যক্তিমালিকানায় নতুন শিল্প কারখানা তৈরিতে ঋণ প্রদান করে। কিন্তু পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিন্যান্স কর্পোরেশন ঋণ প্রদানে যথেষ্ট ছিলনা ফলে ১৯৬১ সালে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অফ পাকিস্তান গঠন করা হয়। ১৯৫৭ সালে আর একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়েছিল যার নাম ছিল, 'দি পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন।' ১৯৫০ সালে 'পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিভেলপমেন্ট কর্পোরেশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা পাকিস্তানে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। কিন্তু ১৯৬০ সালে এটিকে স্বতন্ত্র ভাবে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। একটির নাম রাখা হয় 'ওয়েষ্ট পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিভেলপমেন্ট কর্পোরেশন' এবং অন্যটি 'ইস্ট পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিভেলপমেন্ট কর্পোরেশন'। এই প্রতিষ্ঠান দু'টি দুই পাকিস্তানে আলাদা ভাগে বিভক্ত করা হয়।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠান গুলো পূর্ব পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলের শিল্পায়নের উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি। অল্প কিছু সংখ্যক শিল্প ব্যক্তিমালিকানায় এখানে গড়ে ওঠেছিল যা ছিল ক্ষুদ্রমাত্রায় এবং শ্রমনিবিড় শিল্প।

১৯৪৭-১৯৭১ সাল পর্যন্ত যে শিল্পনীতি সমূহ ছিল তা মূলত পশ্চিম পাকিস্তানের ২৪ পরিবারকেই শুধু

শিল্পপতি করেছে। অফিসিয়ালনীতি সমূহ আন্তর্জাতিক ভাবে পুঁজিবাদীদের এবং শিল্পপতিদের আয় বৃদ্ধি করে, সামাজিক এবং কল্যাণ কার্যক্রম অবহেলিত হয় এবং গ্রামীণ ও কৃষিখাতের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে শিল্পায়ন চাপিয়ে দেওয়া হয়। এখান থেকে দেখা যায় যে, পুঁজিবাদের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সঞ্চয়, বিনিয়োগ এবং উদ্যোক্তা বৃদ্ধির জন্য কার্যকর অসমতা প্রয়োজন। এই বিষয়টি লক্ষ্য করা যায় পাকিস্তানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে।

১৯৪৯-৫০ থেকে ১৯৫৪-৫৫ সালে পাকিস্তানে বার্ষিক উৎপাদন বেশ বৃদ্ধি পায়। এই বৃদ্ধিটা ছিল নিম্নস্তরের শিল্পের বৃদ্ধি। বিনিময় হারের অধিক মূল্য এবং মূলধনী পন্য আমদানীর উপর শুল্ক হ্রাস এর কারনে মাধ্যমিক এবং চূড়ান্ত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। শিল্পের এই সমস্ত উন্নয়ন পূর্ব পাকিস্তানকে স্পর্শ করতে পারেনি। পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তান অনেক পিছিয়ে ছিল। যদিও পূর্ব পাকিস্তানেই শিল্পায়নের বেশী সম্ভাবনা ছিল।

১৯৫৯-১৯৬০ সালের স্থির মূল্যে, ১৯৬৯-১৯৭০ সালে মোট দেশজ উৎপাদনে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে শিল্পের অবদান ছিল ৭.৮ শতাংশ, যা ১৯৪৯-১৯৫০ সালের তুলনায় ৩.০ শতাংশ বেশী।

১৯৬৮-৬৯ সালে নিবন্ধনকৃত শিল্প কারখানার সংখ্যা ছিল ৩১৩০টি যার মধ্যে ৭৯১টি টেক্সটাইল, ৫৭৬টি ক্যামিক্যাল এবং ৪৩৬টি খাদ্য তৈরি কারখানা ছিল (Government of Bangladesh, The two year plan 1978-80. The planning comission Dhaka, 1978.) । তখন নিবন্ধনকৃত শিল্প কারখানা ছাড়াও অনেক শিল্প কারখানা ছিল। ১৯৬৯ সালে একটি জরিপের হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানে গ্রামীণ এলাকায় ৩৩০৪০০টি শিল্প কারখানা ছিল যার মধ্যে ৮২ শতাংশই ছিল কুটির শিল্প।

এটা গুরুত্বের সাথে প্রকাশ করা যায় যে, পাকিস্তানী শাসন আমলে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উৎপাদন ও শ্রমিক নিয়োগের যে ব্যাপক সম্ভাবনা ছিল তা অনেকাংশে অবহেলিত করা হয়েছে। যদিও পাকিস্তানের পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উপেক্ষিত ছিলনা। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের অনেক সমস্যা ছিল, যার মধ্যে পরিকল্পনা তৈরির দক্ষতার অভাব, কারিগরি জ্ঞানের অভাব, পুঁজির অভাব এবং এই ধরনের অন্যান্য সমস্যা। ১৯৫৭ সালে ক্ষুদ্র শিল্পকে সহযোগিতা করার জন্য 'দি ইস্ট পাকিস্তান স্মোল ইন্ডাষ্ট্রিইস কর্পোরেশন' নামে প্রতিষ্ঠানটি তৈরি করা হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে প্রতিষ্ঠানটি কিছু কারখানা তৈরি ছাড়া কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি। এই প্রতিষ্ঠানের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলে যথা রাজশাহী, বগুড়া এবং ঠাকুরগাঁও অঞ্চলে কয়েকটি শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছিল।

২.৩ *১৯৭২ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত উত্তরাঞ্চর শিল্পায়নের অবস্থা*

১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাসের মহান মুক্তিযুদ্ধের ফলে বাংলাদেশ সম্পূর্ন ভাবে ঔপনিবেশ মুক্ত হয়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে শিল্পখাত মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসময় বিল্ডিং ধংস্ব, মেশিন, সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, খুচরা যন্ত্রাংশ এবং চূড়ান্ত দ্রব্যের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। অনেক শিল্প করখানা যুদ্ধের কয়েক মাস পর পূনরায় উৎপাদন শুরু করে, কিন্তু অনেক সমস্যা দেখা দেয়। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয় যা শিল্পকে ধ্বংস করে। অবাঙ্গালি শিল্পপতিগন, অভিজ্ঞ ব্যবস্থাপক ও দক্ষ শ্রমিক বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যায়। ফলে স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে শিল্প ব্যবস্থাপনায় এক অভূতপূর্ব শূন্যতার সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে রাজনৈতিক চিন্তাধারারও পরিবর্তন ঘটে। ১৯৬৯-এর যে রাজনৈতিক চেতনা বাঙ্গালি জাতিত্বের সৃষ্টি করে তা আবার শিল্প বিকাশের মূলনীতিতে

পরিবর্তন আনে। পাকিস্তান আমলে পুঁজিবাদী মূলনীতি শিল্পায়নের নির্ধারক ছিল। ফলে ব্যক্তি মালিকানায় শিল্পায়নকে প্রাধান্য দেয়া হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প গড়ে উঠেছিল কেবল মাত্র সেখানে, যেখানে ব্যক্তিমালিকানায় শিল্প বিকাশের সম্ভাবনা কম ছিল বা সম্পূর্ন অনুপস্থিত ছিলো। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশকে সমাজতান্ত্রিক দেশে রূপান্তরিত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। যারা রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেন তাঁরা অন্যান্য সবক্ষেত্রের মতো শিল্পায়নও সমাজতন্ত্র ভিত্তিক করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। তার প্রতিফলন দেখা যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রদত্ত জাতীয় সংবিধানে। শিল্প ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ পরিত্যাগ করে সমাজতন্ত্র ভিত্তিক অবকাঠামো গড়ে তোলার প্রত্যয় এ সংবিধানে ছিল। তাই রাষ্ট্রীয় খাতের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশের সমকালীন রাজনৈতিক চেতনায় সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রখর ছিলো বলে স্বাধীনতা প্রাপ্তির অল্প সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চে প্রণীত হয়ঃ 'বাংলাদেশ শিল্প কারখানা জাতীয়করণ অধ্যাদেশ'। ফলে স্বাধীন বাংলাদেশে একটি বৃহৎ ও শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় খাতের সৃষ্টি হয়। সমাজতন্ত্র স্থাপনের প্রত্যাশা ব্যতীত আরো একটি প্রয়োজনীয় কারণ ছিলো এ অধ্যাদেশ জারি করার। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে বহু অবাঙ্গালি মিল মালিক, ব্যবস্থাপক ও শ্রমিক এদেশ থেকে চলে যাওয়ায় শিল্পব্যবস্থাপনায় একটি বড় ধরনের শূন্যতা সৃষ্টি হয়। এ শূন্যতা পূরণ করার জন্য যথেষ্ট বাঙ্গালি বেসরকারি শিল্পপতি কিংবা ব্যবস্থাপক ছিলো না। ফলে সরকারকে বাধ্য হয়ে সমস্ত পরিত্যক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান নিজের মালিকানায় ও ব্যবস্থাপনায় আনতে হয়। তখনকার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে এ জাতীয়করণ যুক্তিসঙ্গত ও অপরিহার্য ছিল। ১৯৭২ সালের শিল্প কারখানা জাতীয়করণ অধ্যাদেশ জারি হওয়ার কারণে দেশের শতকরা ৮৫ ভাগের বেশি শিল্প-কারখানা পরিসম্পদ রাষ্ট্রীয় খাতে চলে আসে। তবে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ নবগঠিত রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অনেকগুলো শিল্প প্রতিষ্ঠান আগে থেকেই রাষ্ট্রায়ত্ত ছিল। নবগঠিত রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প খাতের মোট সম্পদের শতকরা ৪৫ ভাগের মতো ১৯৭২ সালে জাতীয়করণ অধ্যাদেশ জারি করার আগে থেকেই রাষ্টায়ত্ত ছিলো। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে অন্তর্ভূক্ত হয় তাদের মধ্যে প্রাক ১৯৭২ এর 'ইষ্ট পাকিস্তান ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন' এর মালিকানাধীন ৫৩টি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান, বাঙ্গালি মালিকানাধীন ৭৫টি পাট ও বস্ত্রকল, পাকিস্তানীদের পরিত্যক্ত ১১১টি বৃহৎ ও প্রায় ৪০০টি ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল। সবগুলো মিলে দেশের গোটা শিল্পখাতের ৮৫% ভাগের অধিক। এ নবগঠিত রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পখাতের মোট সম্পদের ৪৫% ইতিপূবেই রাষ্ট্রায়ত্ত ছিলো। বাকি ৫৫% সম্পদ নতুন ভাবে রাষ্টায়ত্ত করা হয়। ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে পরিত্যক্ত ও ক্ষুদ্র ইউনিটগুলো মিলিয়ে মোট শিল্প সম্পদের শতকরা ৬১ ভাগ ছিল এবং বাকি ৩৯% সম্পদ সংগৃহীত হয় বাঙ্গালি বৃহৎ কল-কারখানাগুলো (পাট ও বস্ত্রকল) রাষ্ট্রায়ত্ত করে।

রাষ্ট্রীয় শিল্প খাত যেখানে গোটা শিল্প সম্পদের ৮৫% ভাগের মালিক, স্বভাবতই রাষ্ট্রের উপর পুরোপুরি দায়িত্ববর্তায় শিল্পোন্নয়নের। তাই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় নীতিমালার ভিত্তিতে শিল্প বিকাশের পরিকল্পনা করা হয়। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শিল্প ব্যবস্থাপনায় নতুন পদ্ধতি চালু করা হয়। পূর্বের 'ইষ্ট পাকিস্তান ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন' ভেঙ্গে নয়টি আধা-সরকারী কর্পোরোশন স্থাপিত হয়; এ কর্পোরেশন গুলো ছিলঃ

১। বাংলাদেশ জুট মিলস্ , ২। বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ ৩। বাংলাদেশ সুগার মিলস্ ৪। বাংলাদেশ ফুড এন্ড এলাইড ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন, ৫। বাংলাদেশ স্টিল মিলস্ কর্পোরেশন, ৬। বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড শিপিং কর্পোরেশন, ৮। বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার, কেমিক্যাল এন্ড

ফার্মাসিউটিক্যাল কর্পোরেশন, ৯ । বাংলাদেশ টেনারীজ কর্পোরেশন ।

গোড়ার দিকে এ ৯টি কর্পোরেশনের অধীনে সমজাতীয় শিল্প ইউনিটগুলো পরিচালিত হতে থাকে । পরে অবশ্য ব্যবস্থাপনার সুবিধা ও ব্যয়হ্রাসের জন্য এ কর্পোরেশনের সংখ্যা ৯ থেকে ৫ এ আনা হয় । এজন্য বাংলাদেশ সুগার মিলস্ কর্পোরেশন ও বাংলাদেশ ফুড এন্ড এলাইট ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন দুটোকে একত্রিত করে বাংলাদেশ সুগার এন্ড ফুড ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন নামে নতুন একটি কর্পোরেশন করা হয় । সেভাবে স্টিল মিলস্ কর্পোরেশন এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ও শিপিং কর্পোরেশনদ্বয়কে বাংলাদেশ স্টিল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন নামে একটি নতুন কর্পোরেশন সৃষ্টি করা হয় । এ পাঁচটি ব্যতীত শিল্পের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত আরো কয়েকটি কর্পোরেশন ও সৃষ্টি হয় । যেমন: বাংলাদেশ বনজ শিল্প সংস্থা, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন ।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশ শিল্প কারখানা জাতীয়করণ অধ্যাদেশ, জারি হবার পর একটি শক্তিশালী সরকারী খাত গড়ে ওঠে । তবে গোটা অর্থনীতির প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয়করণ মোটামুটি বৃহৎ শিল্পে সীমাবদ্ধ ছিলো । ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প আকারে ও কর্মসংস্থানের দিক থেকে বড় হওয়া সত্ত্বেও বেসরকারি খাতে ছিল । জাতীয়করণকৃত শিল্পখাতের আকার ও গুরুত্ব বৃদ্ধির রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রথম কয়েক বৎসর থাকলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এ চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটতে থাকে । সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো আর্থিক লোকসান দিতে থাকে । সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে গঠিত রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে শ্রমিক ইউনিয়নের যে ভূমিকা হওয়া দরকার ছিলো তা কোন ট্রেড ইউনিয়নে পরিলক্ষিত হয়নি । তখনকর ট্রেড ইউনিয়নসমূহে নেতৃত্বের দূরদর্শী সম্পন্ন পরিপক্কতা ছিলো না । শ্রমিকদের দীর্ঘমেয়াদি কল্যাণ সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে উৎপাদন বৃদ্ধি করে লাভজনক করে তোলার চাইতে শ্রমিক রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে দরকষাকষি করে সর্বোচ্চ আর্থিক লাভ আদায়ের প্রবনতা দেখা দেয় । প্রশাসনিক কাঠামোর নিয়ন্ত্রক আমলাগণও এ সুযোগ নিতে থাকেন । ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে সমস্যা দেখা যায় । তাই রাজনৈতক ও প্রশাসনিক মহলের কোন কোন অংশ সমাজন্তমুখী রাষ্টায়ত্ত খাতের নীতি পরিবর্তনের প্রয়োজন বোধ করেন । ফলে ১৯৭৪ সালে বিনিয়োগ নীতি নতুন করে পরিবর্তন হয় । বেসরকারি খাতে পুঁজির সীমাবদ্ধতা কিছু হ্রাস করা হয় । এর আগে পর্যন্ত বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ বেসরকারি খাতে ২৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করতে পারতেন । একটি ভাল শিল্প ইউনিট গড়ে তুলতে এ পরিমাণ অর্থ প্রয়োজনের তুলনায় কম অর্থাৎ বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের অন্তরায় ছিলো । তাই ১৯৭৪ সালের জুলাই মাসে পূর্বের সিলিং ২৫ লক্ষ টাকা থেকে ৩ কোটি টাকায় করা হয় ।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট এক রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সরকারকে উৎখাত করে এবং তাঁকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করে । এর পর থেকে যে সমস্ত সরকার ক্ষমতা গ্রহন করেছে তারা সবাই ঢালাও ভাবে শিল্পকে বিরাষ্ট্রীয়করণ করেছে । ১৯৭৬-৮২ জুনের মধ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরণের মোট ৯০টি কারখানা থেকে সরকারি পুঁজি প্রত্যাহার করা হয় । এ বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতি আরোও কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করা হয় ১৯৮২ সালের জুনের পর থেকে । পঁচাত্তর পরবর্তী সরকারগুলো বিশ্বব্যাংক, আই.এম.এফ ও এডিবির মত সাম্রাজ্যবাদী সংস্থাগুলোর পরামর্শে ঢালাও বেসরকারীকরণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে শুরু করে । কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের এই সব প্রেসক্রিপশন আমাদের শিল্পের ভিত মজবুত করতে পারেনি বরং বিশাল ঋণখেলাপী সংস্কৃতি সৃস্টি হয়েছে । উত্তরবঙ্গে শিল্পের অবস্থা আরোও ভয়াবহ হয়েছে ।

টেবিল ১ : বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনে শিল্পের অংশ, ১৯৯৩-২০০২ সময়ে (১৯৯৫-৯৬ সালের মূল্যে) %

খাত	বছর								
	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৫৬	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০৭-০৮
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১। কৃষি ও বন	২০.৮১	২০.৩২	২০.৩৯	১৯.৬৭	১৯.৩৫	১৯.৪৯	১৯.৫১	১৮.৫৮	১৬.২
২। মৎস্য	৫.২১	৫.৩৬	৫.৪৮	৫.৬৭	৫.৯৩	৬.০৯	৫.৫১	৫.৪০	৪.৬
৩। শিল্পঃ	১৫.১৫	১৫.৪৩	১৫.৪১	১৫.৮৮	১৫.৬০	১৫.৪০	১৫.৫৯	১৫.৭৬	১৭.৮
(ক) বৃহৎ শিল্প	১০.৮৮	১১.০১	১০.৮৮	১১.২৯	১১.২০	১১.০১	১১.১৩	১১.১৬	১২.৬
(খ) ক্ষুদ্র শিল্প	৪.২৭	৪.৪২	৪.৫৩	৪.৫৯	৪.৪১	৪.৩৯	৪.৪৬	৪.৬০	৫.২
৪। নির্মান	৬.৬৩	৬.৮৯	৭.১২	৭.৩৯	৭.৬৭	৭.৮৪	৮.০৮	৮.৪১	৯.১
৫। খনি		১.০১	১.০৫	১.০৩	১.০৩	১.০০	১.০৩	১.০৭	১.০৭
১.২									
৬। পাইকারী ও খুচরা ব্যবসা	১২.৮৯	১২.৯১	১২.৯৪	১৩.০২	১৩.২১	১৩.৩৫	১৩.৪৮	১৩.৭৭	১৪.৪
৭। হোটেল ব্যবসা	০.৬১	০.৬১	০.৬১	০.৬২	০.৬৩	০.৬৩	০.৬৪	০.৬৬	০.৭
৮। বিদ্যুৎ: গ্যাস ও পানি সরবরাহ	১.৪৯	১.৫০	১.৫০	১.৪৬	১.৪১	১.৪১	১.৪৩	১.৪৬	১.৬
১০। আর্থিক মধ্যস্থতা	১.৫৭	১.৫৮	১.৫৮	১.৫৭	১.৫৮	১.৫৭	১.৫৭	১.৬১	১.৮
১১। আবাসিক	৯.৫৬	৯.৪৬	৯.৩১	৯.১৮	৯.০৭	৮,৮৮	৮.৭১	৮.৬৩	৭.৫
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	২.৫২	২.৫২	২.৫২	২.৫৪	২.৫৫	২.৫৫	২.৫৬	২.৬০	২.৮
১৩। শিক্ষা	২.১১	২.০৭	২.০৬	২.১২	২.১৭	২.২০	২.২৪	২.৩১	২.৬
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা সমূহ	২.৩২	২.২৮	২.২৫	২.২৩	২.২৩	২.২০	২.১৯	২.২১	৭.০
GDP স্থির মূল্য	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ-২০০২; বাংলাদেশ, বার্ষিক রিপোর্ট, ২০০৭-০৮।

২.৪ বাংলাদেশের শিল্পায়নের বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশের বিপুল জনসংখ্যার কর্মসংস্থান ও জীবন মাত্রার মানোন্নয়ন তথা দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিল্পায়নের কোনও বিকল্প নেই। অথচ স্বাধীনতার ৩৬ বছরেও বাংলাদেশ শিল্পায়নের তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি তৈরি করতে পারেনি। আমাদের দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের কাঠামোর দিকে তাকালেই এটা স্পষ্ট বোঝা যায়(টেবিল-১) ।

টেবিল-১ এ উপস্থাপিত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বিগত দেড় দশকে মোট দেশজ উৎপাদনে শিল্পের অংশ প্রায় একই রয়েছে ১৯৯৪-৯৫ সালে ১৫.১৫% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৭-০৮ সালে মাত্র ১৭.৮% এ উন্নীত হয়েছে। ঐ একই সময় কৃষির অংশ ৪.৬% হ্রাস পেয়েছে। ১৯৯৪-৯৫ সালের কৃষির অবদান ২০.৮১% থেকে ২০০৭-২০০৮ সালে গিয়ে ১৬.২% এ ঠেকেছে। অর্থাৎ কৃষির অংশ হ্রাসের অনুরূপ শিল্পের অংশ বাড়েনি, বেড়েছে অন্যান্য খাতের অংশ সেগুলো মূলতঃ অনুৎপাদনশীল খাত অথবা সরাসরি বস্তুগত উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এটার মানে দাঁড়াচ্ছে এই যে, আমাদের অর্থনীতিতে প্রত্যাশিত কাঠামোগত পরিবর্তন আসছে না বা আমরা আনতে ব্যর্থ হচ্ছি ,দেশের শিল্পায়ন হচ্ছে না।

টেবিল ২ : খাত ভিত্তিক বার্ষিক মোট দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি
১৯৯৩-২০০২ সময়ে (১৯৯৫-৯৬ সালের মূল্যে)

(%)

খাত	বছর								
	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০৭-০৮
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১। কৃষি ও বন	১.৯৩	২.০৩	৫.৫৭	১.৬৪	৩.২৪	৬.৯২	৫.৫৩	-০.৬২	৩.৫
২। শিল্পঃ যার মধ্যে	১০.৪৮	৬.৪১	৫.০৫	৮.৫৪	৩.১৯	৪.৭৬	৬.৬৮	৫.৫৮	৭.৪
(ক) বৃহৎ শিল্পঃ	১১.৪৪	৫.৬৭	৩.৯৭	৯.২৮	৪.১৯	৪.৩৫	৬.৫৫	৪.৬০	৭.২
(খ) ক্ষুদ্র শিল্পঃ	৮.১০	৮.২৮	৭.৭৫	৬.৭৭	০.৭৫	৫.৮০	৭.০২	৭.৬৯	৭.৯
৩। নির্মাণ	৯.৫৬	৮.৫০	৮.৬৪	৯.৪৮	৮.৯২	৮.৪৮	৮.৬৫	৮.৬১	৫.৯

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ-২০০২

বাংলাদেশে শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি কেমন তা দেখার জন্য আমরা খাত ভিত্তিক বার্ষিক মোট দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি দেখব (টেবিল-২)।

টেবিল ২ এর তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৯৪-৯৫ সালের তুলনায় শিল্পের প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি না পেয়ে বরং হ্রাস পেয়েছে। কৃষির প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক (২০০১-০২)। শিল্পের উন্নয়ন মানে এই নয় যে, শুধু শিল্পেরই উন্নয়ন। শিল্পের উন্নয়নের সাথে অনেক বিষয় সংযুক্ত থাকে। উন্নয়নশীল দেশের শিল্পের

উন্নয়নের জন্য কৃষির উন্নয়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এসমস্ত দেশ গুলোতে কৃষি ভিত্তিক শিল্পের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী। উন্নত দেশ গুলোর তুলনায় আমাদের শিল্পের প্রবৃদ্ধি খুবই কম। তাই শিল্পায়নের জন্য আরো বেশী প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে। তবে অবশ্যই অন্যান্য খাতের প্রবৃদ্ধি ঠিক রেখে।

শিল্পায়নের তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত হচ্ছে মৌলিক ভারী শিল্প। কিন্তু স্বাধীনতার ৩৮ বছরেও আমাদের শিল্পের শক্ত ভিত তৈরী করতে আজও আমরা পারিনি।

২.৫ *বাংলাদেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার সাফল্য*

বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন অধিকহারে বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষন, রপ্তানি বৃদ্ধি করা, বৈদেশিক মুদ্রা আয় বৃদ্ধি এবং দারিদ্র বিমোচনের উদ্দেশ্যে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি। বেপজার উদ্দেশ্য লক্ষ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান, শত শত কোটি ডলারের বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ আকর্ষন ও বাণিজ্যের দ্রুত সম্প্রসারণ। দেশী ও বিদেশী পুঁজিবিনিয়োগকারীদের আকর্ষনের জন্য বাংলাদেশের অবস্থান এমন একটি জায়গায় যেখানে যুগ যুগ ধরে বৈদেশিক পুঁজিবিনিয়োগ ও বাণিজ্য আকৃষ্ট হয়েছে।

"বাংলাাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ আইন- ১৯৮০", সংসদে পাশ হওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) একটি স্বায়ত্ব শাসিত সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সে সময় হতে বেপজা বাংলাদেশের ইপিজেডসমূহে বিনিয়োগ আকর্ষন ও বিনিয়োগ প্রবাহ ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করছে। বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আরো আস্থাশীল করার লক্ষ্যে "বিদেশী বেসরকারী বিনিয়োগ (উন্নয়ন ও রক্ষণ) আইন, ১৯৮০" অনুমোদিত হয়।

ইপিজেড স্থাপনের উদ্দেশ্য

১) বিদেশী পুঁজিবিনিয়োগ আকর্ষন ও উন্নয়ন
২) রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মূদ্রা আয় বৃদ্ধি
৩) রপ্তানির উন্নয়ন
৪) পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন
৫) শ্রম ও ব্যবস্থাপনার উৎকর্ষ সাধন
৬) বিদেশী ও আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর
৭) পশ্চাদসংযোগ শিল্পের (Backward linkage industries) স্থাপন ও সম্প্রসারণ
৮) রপ্তানি বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণ
৯) ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন
১০) প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সাধন
১১) আন্তর্জাতিক বাজারে বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন
১২) সর্বোপরি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

এশিয় অঞ্চলের পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের নতুনভাবে বিনিয়োগে উৎসাহিত করে তাদের বিনিয়োগ কৌশল ও পরিকল্পনা পরিবর্তন করে এশিয়ান অঞ্চলে বিনিয়োগ স্থানান্তর করছে। এ ধরনের পরিবর্তন বাংলাদেশে সরাসরি বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ আকর্ষনে সুযোগ বয়ে এনেছে। বর্ধিত উৎপাদন খরচ ও শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধির কারণে এশিয়ার অনেক

দেশেই শ্রমঘন বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হচ্ছে। থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া ইতোমধ্যেই আরো উন্নতর প্রযুক্তিগত শিল্প স্থাপনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। চীন, ফিলিপাইনস, শ্রীলংকা এমনকি ভিয়েতনামেও উত্তরোত্তর শ্রমিকের পারিশ্রমিক ও উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে যার কারণে পুঁজি বিনিয়োগকারীগণ কম খরচে উৎপাদনের স্থান হিসেবে সে সকল দেশে বিনিয়োগে আগ্রহ হ্রাস পাচ্ছে। এ সকল অবস্থার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ এ অঞ্চলে বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষনের নতুন ও আদর্শ স্থান হিসেবে আত্ম প্রকাশ করেছে।

শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে আরো ব্যাপক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে, সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষনের উদ্দেশ্যে, দারিদ্রে বিমোচনের প্রয়াসে ও রপ্তানি বৃদ্ধিকল্পে সরকারকে বর্তমান ইপিজেডসমূহের সম্প্রসারণ ও যথাযথ স্থানে নতুন ইপিজেড স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে।

২.৬ *বাংলাদেশের শিল্পনীতি*

বাংলাদেশের অর্থনীতি সমাজতান্ত্রিক কাঠামোতে বিকশিত করার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে গোটা শিল্প খাতের ৮৫ ভাগেরও অধিক সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। রাষ্ট্রীয় শিল্পসমূহকে সুসংবদ্ধ করা ছিলো তদানীন্তন শিল্পনীতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। তবে শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় খাতের পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত দুর্বল বেসরকারি খাতে শিল্প বিনিয়োগের সুযোগও দেয়া হয়। এ সুযোগ অবশ্য খুবই সীমাবদ্ধ ছিলো। তখন একজন বেসরকারি শিল্পোদ্যোক্তা সর্বাধিক ২৫ লক্ষ টাকা একটি শিল্পে বিনিয়োগ করতে পারতেন। অবশ্য এ পরিমাণ পুঁজি দিয়ে তেমন কোন শিল্প স্থাপন করা যেতো না।

ইতোমধ্যে বিভিন্ন কারণে রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো অসংখ্য সমস্যার সম্মুখীন হয়। ব্যবস্থাপকদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার অভাব, কঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশের অভাব, বাজারের অভাব, দূর্নীতি ও অনাকাঙ্খিত রাজনৈতিক প্রভাবের ফলে রাষ্ট্রীয় কর্পোরেশনগুলো প্রচুর লোকসান দিতে থাকে। তাই ব্যক্তিমালিকানায় বেসরকারি খাতকে শক্তিশালী করার শিল্পনীতি প্রণয়নের প্রচেষ্টা দৃঢ়তর হয়। ১৯৭৩ সালে ঘোষিত শিল্পনীতি অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুতে ব্যর্থ হওয়ায় সরকার ১৯৭৪ সালে সংশোধিত শিল্পনীতি ঘোষণা করেন। এ শিল্পনীতি কার্যকরী হবার আগেই ১৯৭৫ সালে দেশে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়। ১৯৭৫ সালের শেষে নতুন করে শিল্পনীতি ঘোষণা করা হয়। এ শিল্পনীতিতে সরকারি খাতের আপেক্ষিক গুরুত্ব স্বীকার করা হয়। প্রধান প্রধান শিল্প জাতীয়করণের পরিকল্পনা সরকারের নেই বলে ঘোষণা করা হয়। ১৯৭৫ শিল্পনীতিতে বেসরকারি খাতকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করা হয়। ১৯৭৫ সালে বেসরকারি খাতে পুঁজি বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা শিথিল করা হয়। ১৯৭৪ সালে বেসরকারি খাতে পুঁজি বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা ছিলো ৩ কোটি টাকা। ১৯৭৫ সালের শিল্পনীতিতে এ সীমা বৃদ্ধি করে ১০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। তাছাড়া বেসরকারি উদ্যোক্তাদের উৎসাহ প্রদানের জন্য বিভিন্ন প্রকার সুযোগ সুবিধাও ঘোষণা করা হয়। বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য ১৯৭৫ সালের শিল্পনীতিতে বৈদেশিক বিনিয়োগের শর্তাবলী শিথিল করা হয়। এরপর ১৯৭৭ সালে ঘোষিত শিল্পনীতি সরকারি খাতের আকার হ্রাস করে। এছাড়া বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করার জন্য কিছু কিছু নতুন সুযোগ দেয়া হয়। কর-কাঠামো বিন্যাসের প্রয়াসও দেখা যায়। শেয়ার মার্কেট উন্নয়নের জন্যও বিভিন্ন ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৭৫ সাল থেকেই বেসরকারি খাত বিকাশের অনুকূলে শিল্পনীতি প্রণয়ন আরম্ভ হয়। এ প্রচেষ্টার

সর্বাধিক প্রকাশ ঘটে ১৯৮২ সালের শিল্পনীতিতে। এ শিল্পনীতিতে সরকারি উদ্যোগের চেয়ে বেসরকারি উদ্যোগের ওপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। বেসরকারি খাতের বৃহত্তর অংশ গ্রহণের মাধ্যমে শিল্পোন্নয়নের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে (পাটকল, বস্ত্রকল, ইত্যাদি) ক্রমান্বয়ে বেসরকারি খাতে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সরকারি ও বে-সরকারি খাতে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার ১৯৮৬ সালে এবং পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে সংশোধিত শিল্পনীতি ঘোষণা করেন। দেশের দ্রুত শিল্পায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৯ সালে শিল্পনীতি প্রণয়ন করে এবং সর্বশেষ ২০০৫ শিল্পনীতি প্রণীত হয়।

৩। *উত্তরাঞ্চলে সৈয়দপুরে শিল্পায়নের সমস্যা*

সার্বিক ভাবে বাংলাদেশের শিল্পায়নের যেসকল সমস্যা রয়েছে উত্তরাঞ্চলের শিল্পায়নের ক্ষেত্রেও একই সমস্যাগুলো পরিলক্ষিত হয। তবে বাংলাদেশের শিল্পায়নের অন্যান্য সমস্যা সহ এই অঞ্চলে আরোও কিছু সমস্যা রয়েছে। তাই আমরা বাংলাদেশের শিল্পায়নের সমস্যা ও উত্তরাঞ্চলে নির্দিষ্ট সমস্যা গুলি তুলে ধরার চেষ্টা করব।বাংলাদেশে শিল্প কারখানা যেভাবে স্থাপিত হয়েছে তাতে অন্যান্য অঞ্চলের সাথে উত্তরাঞ্চলের একটি উজ্জল বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়।

নিম্নে টেবিল- ৩ হতে আমরা বাংলাদেশের বিভাগ ভিত্তিক আয়তন, লোক সংখ্যা, বর্তমান মূল্যে মোট দেশজ উৎপাদন (GDP), মাথা পিচু GDP এবং প্রবৃদ্ধি হার (চার বছরে গড়) দেখব।

টেবিল- ৩ হতে দেখা যায় যে, উত্তরবঙ্গ তথা রাজশাহী বিভাগের আয়তন দেশের মোট আয়তনের ২৩.৩৮ ভাগ, জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৪৭.৬১ ভাগ, ফলে এটা প্রতীয়মান হয় যে, এখানে বিশাল শ্রম শক্তি রয়েছে। বর্তমান মূল্যে GDP অংশ ২০.৩৬%, মাথাপিছু GDP ১৫১৭৪ টাকা এবং প্রবৃদ্ধির হার ৫.৮১%।

এমন আমরা আমাদের নির্বাচিত জেলার GDP তে খাত ভিত্তিক অবদান দেখব।

উপরোক্ত টেবিল- ৪ হতে দেখা যায় যে, ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে নীলফামারী জেলার GDP তে কৃষির অবদান ছিল ৩৫.১০ শতাংশ। তা ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে খুব সামান্য কমে ৩৪.৮৫ শতাংশ হয়েছে। আর শিল্প খাতের অবদান ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে অবদান ছিল ১৩.১৮ শতাংশ তা ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে হয়েছে ১৪.৩৬ শতাংশ। আর ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে GDP তে অবদান ছিল মাত্র ২.০৯ শতাংশ এবং তা ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে কমে হয় ২.০ শতাংশ। উপরোক্ত পরিসংখ্যানে এই অঞ্চলে শিল্পের দূরবস্থা ফুটে উঠে।

আমরা গবেষণা এলাকার ২০টি বিভিন্ন ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠানে গিয়ে তাদের কাছ থেকে টেবিল-৫-এ বর্ণিত তথ্য ও সমস্যা সমূহ জানতে পারিঃ

উপরোক্ত আলোচনা, মাঠ পর্যায়ে জরিপ এবং স্থানীয় পত্রিকাগুলোর বিভিন্ন ফিচারের ভিত্তিতে উত্তরাঞ্চলে সৈয়দপুরে শিল্পায়নের সমস্যাসমূহ বর্ণনা করা হল।

৩.১ *জ্বালানী সমস্যা*

বৃহৎ, মাঝারি শিল্প ও উত্তরা ইপিজেড এ অনুসন্ধানে গিয়ে জানা গেছে যে, তাদের উৎপাদনে প্রধান

টেবিল ৩ : বাংলাদেশের বিভাগ ভিত্তিক পরিসংখ্যান (১৯৯৯-২০০০ সময়ে)

বিভাগ	আয়তন (বর্গ কি.মি.)	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	বর্তমান মূল্যে GDP (মি.টাকা)	মাথাপিছু GDP		প্রবৃদ্ধি হার (চার বছরে গড়)
				টাকা	মার্কিন ডলার	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১. বরিশাল	১৩২৯৭	৮.৯২	১৩৭২৭	১৫৩৮৩	৩০৬	৫.১৭
২. চট্টগ্রাম	৩৩৭৭১	২৫.৩০	৪৫৮৬৫৭	১৮১২৮	৩৬০	৫.১১
৩. ঢাকা	৩১১১৯	৪০.১২	৮৯৪৬৯৭	২২৩০৩	৪৪৩	৫.২৮
৪. খুলনা	২২২৭৪	১৫.৩৬	২৭৪৬৪৭	১৭৮৭৫	৩৫৫	৫.৫৪
৫. রাজশাহী	৩৪৫১৩	৬১.৮১	৪৮২৭১৬	১৫১৭৪	৩০২	৫.৮১
৬. সিলেট	১২৫৯৬	৮.২৫	১২২৭৭৬	১৪৮৮৬	২৯৬	৪.৯৫
বাংলাদেশ	১৪৭৫৭০	১২৯.৮	২৩৭০৭৪০	১৮২৬৯	৩৬৩	৫.৩৬

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ-২০০২

টেবিল ৪ : খাত ভিত্তিক নীলফামারী জেলার মোট উৎপাদন (১৯৯৫-১৯৯৬ অর্থবছরে স্থির মূল্যে)

(মিলিয়ন টাকা)

খাত	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-০০
১	২	৩	৪	৫	৬
১. কৃষি	৫২৮৭	৫৭২৪	৫৯১৫	৬১৩২	৬৪৯৭
২. শিল্প যার মধ্যে আছে	১৯৮৬	২১৩৭	২৩০৮	২৪৮২	২৬৭৮
ক) খনি	৪৩	৫২	৫৮	৬৪	৬৬
খ) ম্যানুফ্যাকচারিং	৩১৫	৩৩১	৩৫২	৩৫৯	৩৭৪
গ) বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং পানি সরবরাহ	১৮৫	১৮৭	১৮২	১৯১	২১০
ঘ) নির্মান	১৪৪৩	১৫৬৭	১৭১৬	১৮৯৬	২০২৮
৩. সেবা	৭৩৭৮	৭৭০৯	৮০২৭	৮৪৮২	৮৯৫০
আমদানি শূল্ক	৪০৮	৪৬২	৪৭১	৫০৫	৫১৫
বাজার মূল্যে GDP	১৫০৫৯	১৬০৩২	১৬৭২১	১৭৬০১	১৮৬৪০
প্রবৃদ্ধি	--	৬.৪৬	৪.৪৬	৪.৩০	৫.২৬
জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	১.৫৪	১.৫৭	১.৫৯	১.৬১	১.৬৩
মাথাপিছু GDP (টাকা)	৯৭৭২	১০২৩৫	১০৫০৬	১০৯২১	১১৪১৭

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ-২০০২

প্রতিবন্ধক হল জ্বালানী সমস্যা। এই অঞ্চলে গ্যাস না থাকায় শিল্পকারখানা গুলোতে জ্বালানী হিসাবে ফার্নেস অয়েল ব্যবহৃত হয়। এই ফার্নেস অয়েল মাত্র পাঁচ বছরে ৭ টাকা লিটার থেকে ১৫ টাকা লিটার হয়েছে। এই জ্বালানী ব্যবহারের ফলে উত্তরাঞ্চলে, ঢাকা-চট্টগ্রামের শিল্পে ব্যবহৃত জ্বালানীর চেয়ে দ্বিগুন ব্যয় করতে হয়। ফলে উত্তরাঞ্চলে শিল্পের উৎপাদন খরচ অনেক বেশী হয় যা শিল্পায়নকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে জরিপ থেকে জানা যায়,একেতো জ্বালানী খরচ বেশী তার উপর মাঝেমধ্যে দেখা দেয় ফার্নেস অয়েল এর সরবরাহের অনিশ্চয়তা। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, উত্তরাঞ্চলে ফার্নেল অয়েল সরবরাহ হয় খুলনার দৌলতপুর থেকে এবং এই ফার্নেস অয়েলের সরবরাহ মাঝেমধ্যেই বন্ধ থাকে। এর ফলে উৎপাদনে অনেক বেশী খরচ হচ্ছে। আবার ফার্নেস অয়েলের সরবরাহ বন্ধ হওয়ার কারণে কারখানা যখন তখন বন্ধও হয়ে যেতে পারে। সূত্র মতে জানা গেছে যে, রংপুরের পার্টেক্স কারখানা, আর. কে. ফ্যান, পঞ্চগড়ের মার্শাল ডিস্টিলারীজ, বৈদ্যুতিক কারখানা খাম্বা ও জেমকন সহ

টেবিল ৫ : গবেষণা এলাকার মাঠ পর্যায়ের তথ্য

খাত সমূহ	বেশী (মনেকরে)	কম (মনেকরে)	মোটামুটি (মনেকরে)
১। জ্বালানী খরচ	১৬ জন	-	৪ জন
২। বিদ্যুৎ খরচ	১৫ জন	-	৫ জন
৩। কাঁচামাল প্রাপ্তির সমস্যা	১২ জন	২ জন	৬ জন
৪। কাঁচামালের দাম	১৪ জন	-	৬ জন
৫। শ্রমিক প্রাপ্তির সমস্যা	২ জন	১৪ জন	৪ জন
৬। শ্রমিকের দক্ষতা	২ জন	২ জন	১৬ জন
৭। শ্রমিকের মজুরি	২ জন	৪ জন	১৪ জন
৮। শিল্পঋণ প্রাপ্তির ঝামেলা	১৪ জন	-	৬ জন
৯। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা	-	১৩ জন	৭ জন
১০। বিপনন সমস্যা	৮ জন	৪ জন	৮ জন

উৎসঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৬।

এ অঞ্চলের শতাধিক কারখানা আজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার হুমকির মুখে। জানা যায় যে, ফার্নেস অয়েলের অভাবে এরই মধ্যে রপ্তানিমুখী শিল্প কুষ্টিয়ার বি.আর.বি কেবল'স্ এর উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে। আরও আগে বন্ধ হয়েছে উত্তরাঞ্চলের একমাত্র সিরামিক কারখানা তাজমা সিরামিক। সৈয়দপুরের উত্তরা মিলতো অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে।

হাটি হাটি পা পা করে প্রায় পাঁচ বছর কাটিয়ে দিয়েছে উত্তরা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা নীলফামারী-সৈয়দপুর সড়কের পাশে এই ইপিজেডটি অবস্থিত। এখানকার বেকার ও দরিদ্রে জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির যে উদ্দেশ্য নিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়েছিল তার সামান্যই এতদিনে পূরণ হয়েছে। গোটা ইপিজেডে ১৫৫ টি শিল্প প্লট থাকলেও এ পর্যন্ত বরাদ্দ হয়েছে মাত্র ৬টি। আর চালু হয়েছে একটি মাত্র সুয়েটার কারখানা। স্থানীয় বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বলতে এটিই। আশানুরূপ হারে শিল্প উদ্যোক্তারা এখানে বিনিয়োগ করতে এগিয়ে আসছেন না। মূলত গ্যাস সুবিধা না থাকার কারণেই ইপিজেডটি দেশের বেশির ভাগ বিসিক শিল্প নগরীর মতো অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে

থাকতে পারে। দিনে রাতে তিন পালায় ইপিজেডের মূল ফটকের প্রবেশ ও প্রস্থানে দেখা যায় কয়েক'শ নারী ও পুরষ শ্রমিককে। এরা কাজ করে ইপিজেডে চালু হওয়া একমাত্র হংকং ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান উত্তরা সোয়েটার কারখানায়। প্রায় ৫ বছরে এই একটি মাত্র কারখানাই চালু হয়েছে। ইপিজেডের এক কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনা করে জানা যায় যে, গ্যাস না থাকার কারণে উৎপাদিত পণ্যের ফিনিশিং দিতে হয় ঢাকা, চট্টগ্রামে ফলে উৎপাদিত পণ্যের ব্যয় বৃদ্ধি পায়। যার কারণে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ইপিজেড সম্পর্কে উৎসাহ দেখাচ্ছে না। যদিও শিল্প প্লট ও কারখানা ভবনের ভাড়া ৫০ শতাংশ হ্রাস করা হয়েছে এবং এরই মধ্যে আরো কিছু ট্যারিফ সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

খাতওয়ারি প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার (২০০৩-২০০৪ সময়ে) টেবিল- ৬ এর মাধ্যমে দেখানো হলো।

টেবিল-৬ হতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রাকৃতিক গ্যাস শিল্প ক্ষেত্রে মাত্র ১০.৮৭ ভাগ ব্যবহার হচ্ছে যা গৃহস্থালীর ব্যবহারের চেয়েও কম, যা সত্যই হতাশাজনক।

৩.২ *ঋণ সমস্যা*

স্তম্ভ চিত্র-১ তে দেখা যায়, ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে অনাদায়ীকৃত শিল্পঋণের পরিমাণ ছিল ৯৮৩.৫৬ কোটি টাকা। আর ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরে অনাদায়কৃত শিল্পঋণের পরিমাণ ছিল সবচেয়ে বেশী ৪৯৮০.৬৫ কোটি টাকা।

বাংলাদেশে শিল্পঋণ এর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, শিল্পের সাথে কোন সম্পর্ক নেই এমন লোকও শিল্প ঋণ নিয়েছে। বাংকের শিল্প ঋণের জন্য নির্ধারিত অর্থ অনেক ক্ষেত্রেই অপব্যবহার হয়েছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, স্থানীয় শিল্পপতিদের শিল্পঋণ পেতে অনেক ঝামেলা পোয়াতে হয়। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের এক্ষেত্রে বেশী অসুবিধার কথা জানা গেছে। আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তরা ব্যাংকে যেতে অনীহা প্রকাশ করে। এছাড়া ঘুষ, দূর্নীতিতো আছেই।

এছাড়াও শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বড় বাধা হিসেবে যে দু'টি জিনিস কাজ করে তা হলো 'ইকুইটি' এবং 'কোল্যাটারাল সিকিউরিটি'। কোন উদ্যোক্তা যদি ১ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নিতে চান, তাহলে প্রথম

টেবিল ৬ : খাতওয়ারি প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার (২০০৩-২০০৪ সময়ে)

খাত সমূহ	ব্যবহারের পরিমান (বিলিয়ন ঘনফুট)	শতকরা ব্যবহার
বিদ্যুৎ	১৯৯.৪০	৪৬.৬৩
ক্যাপটিভ	৩২.০৩	৭.৪৯
সার	৯২.৮০	২১.৭০
শিল্প	৪৬.৪৯	১০.৮৭
চা বাগান	০.৮২	০.১৯
মৌসুমী (ইটখোলা)	০.১২	০.০৩
বাণিজ্যিক	৪.৮৩	১.১৩
গৃহস্থালী	৪৯.২২	১১.৫১
সি. এন. জি.	১.৯৪	০.৪৫

উৎসঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০০৫

ধাক্কাতেই তাকে ইকুইটি দিতে হবে এক তৃতীয়াংশ। অর্থাৎ ৩ লাখ টাকা। তাই শিল্প স্থাপন করতে গিয়ে তাকে প্রাথমিকভাবেই বিরাট হোঁচট খেতে হবে। আর জোতজমা বন্ধক দিয়ে দ্বিতীয় দফায় নেমে আসবে কোল্যাটারাল সিকিউরিটি বা অতিরিক্ত জামানতের খড়্গ। উদ্যোক্তা যদি ৮০ লাখ টাকার ঋণের জন্যে আবেদন করেন তাহলে তাঁকে প্রথমে ৭০/৮০ লাখ টাকার যন্ত্রপাতি ঋণদাতা ব্যাংক বা অন্য কোনো সংস্থার কাছে জামানত হিসেবে বন্ধক থাকবে। এই যন্ত্রপাতি ছাড়াও উদ্যোক্তাকে ৭০/৮০ লাখ টাকা মূল্যের বাড়িঘর, জমিজমা অন্যবিধ সহায় সম্পদ জামানত হিসেবে গচ্ছিত রাখতে হবে। তাহলে ব্যাপারটি দাঁড়াচ্ছে ৮০ লাখ টাকার ঋণ নিতে গিয়ে পার্টিকে ৮০ লাখ টাকার যন্ত্রপাতি, ৮০ লাখ টাকার অতিরিক্ত জামানত এবং ৩৩ লাখ টাকার মতো ইকুইটি মোট ১ কোটি ৯৩ লাখ টাকার দায়বদ্ধতা

স্ড়্জ চিত্র ১ : শিল্পঋণের অনাদায়ের পরিমান (১৯৯৪-২০০৫ মার্চ পর্যন্ড় সময়ে)

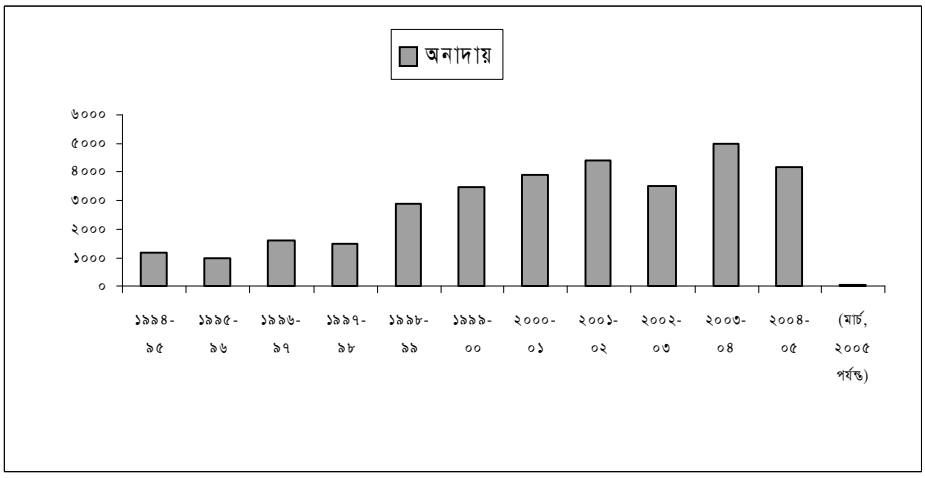

ঋণদাতার কাছে রাখতে হয়।

কোনো একটি প্রজেক্টের বিপরীতে ৭০ লাখ টাকার ঋণের জন্যে আবেদন করে প্রায় ২ বছর অফিসে ঘোরাফেরা করে জুতার সুকতলা ক্ষয় করে ত্যক্ত-বিরক্ত একজন উদ্যোক্তা প্রশ্ন করেন যে, খাজনার চেয়ে বাজনা যেখানে বেশি, সেখানে প্রত্যাশিত শিল্পায়ন যে হবে তার নিশ্চয়তা কোথায়? ১ কোটি টাকার ঋণ পেতেই যেখানে নাভিশ্বাস ওঠে, সেখানে বর্তমান আধুনিক হাইটেকের জামানায় কি হবে? যেখানে প্রয়োজন ২৫, ৫০ বা ১০০ কোটি টাকার বৃহদায়তন শিল্প ঋণের। সেখানে ৫০ বা ১০০ কোটি টাকার 'ইকুইটি' ব্যয় কোল্যাটারাল সিকিউরিটি' যোগান দেবে কে? এর পন্থাই বা হবে কি? বিশেষ করে আমাদের মতো পুঁজি ঘাটতির দেশে।

এ বিষয়ে আমেরিকার 'বেভারলী হিলসে'র ব্যাংকিং পদ্ধতির নজির তুলে ধরা যেতে পারে। আমেরিকাসহ বিশ্বের অনেক উন্নত এবং মুক্তবাজার অর্থনীতির দেশে ঋণদানের

(ক) প্রধান মাপকাঠি হলো আবেদনকারীর সামাজিক ব্যাকগ্রাউন্ড বা পটভূমি,
(খ) আর দ্বিতীয় প্রধান মাপকাঠি হলো প্রকল্পটি অর্থনৈতিকভাবে টেকসই কিনা।

এই দুইটি প্রশ্নে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ যদি সন্তুষ্ট হন তাহলে অন্যান্য আনুষঙ্গিকতা সম্পাদন শিল্প স্থাপনের পথে বড় একটা বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। বরং ব্যাংক বা ঋণদান সংস্থাই পদ্ধতিগত জটিলতা দূর করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে।

অর্থায়নের পথে বিরাজিত তৃতীয় সমস্যা হলো ঋণের দরখাস্তের উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে অস্বাভাবিক বিলম্ব। আর- চতুর্থ সমস্যা হলো- সময়মতো চলতি মূলধন বা ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল না পাওয়া।

চলতি মূলধন ঋণ কবে মঞ্জুর হবে এবং কবে সেই টাকা হাতে আসবে তার কোনো নিশ্চয়তা থাকে না। অবশেষে যখন চলতি মূলধন মঞ্জুর হয় তখন অতীতের দায়দেনা শোধ করতে করতেই ঋণের টাকা শেষ হয়ে যাবার উপক্রম হয়।

৩.৩ *ভ্রান্ড় শিল্পনীতি*

আমরা ইতিপূর্বে শিল্পনীতির যে পর্যালোচনা করেছি তাতে দেখতে পাই যে, শিল্পনীতি সমূহ আমাদের শিল্পের শক্ত ভিত গড়ে তুলতে পারেনি। শিল্পনীতিতে যাও লিখিত সুন্দর সুন্দর প্রস্তাব ছিল তাও নানা কারণে বাস্তবায়িত হয়নি।

সাম্রাজ্যবাদী দেশ ও সংস্থাসমূহের নির্দেশ পরামর্শে আমাদের দেশের পচাঁত্তর পরবর্তী সরকারগুলো একচোখা শিল্পনীতি অনুসরণ করেছে। ব্যক্তিগত খাতের উপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং সরকারী খাতকে অবজ্ঞা করা হয়েছে। দক্ষ উদ্যোক্তার অভাবে এদেশে শিল্পায়ন বাধাগ্রস্ত হয়েছে। উত্তরাঞ্চলে বৃহৎ শিল্পের মধ্যে চিনি শিল্প অন্যতম। কিন্তু সরকারী খাতকে অবজ্ঞা করার ফলে এ শিল্প মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চিনিকল গুলি প্রথমে যে অবকাঠামো নিয়ে চালু হয়েছিল বর্তমানে অবকাঠামোগত উন্নয়ন না হয়ে বরং অবনতি হয়েছে। এটা সরকারী খাতকে অবজ্ঞা করার জন্যই হয়েছে।

শিল্পনীতিতে উত্তরাঞ্চলে শিল্প কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা প্রদানের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই অঞ্চলে শিল্পায়নের জন্য যা বেশী প্রয়োজন তা হল গ্যাস, বিদ্যুৎসহ অন্যান্য অবকাঠামোর উন্নয়ন। এই অঞ্চলে সামান্য ইরিগেশন এর সময় চাষিদের বিদ্যুৎ দিতেই সরকার ব্যর্থ হয়, সেই দৃষ্টিকোন থেকে শিল্পায়নের কথা চিন্তাই করা যায় না। ফলে একজন উদ্যোক্তা যখন উত্তরাঞ্চলে শিল্প স্থাপন করতে আসবে তখন সে এই দিকগুলি চিন্তা করলে দেখবে যে সরকারের প্রদেয় সুযোগ-সুবিধার চেয়ে, তার ক্ষতির পরিমাণ বেশি হচ্ছে। ফলে সে আর এই অঞ্চলে শিল্প কারখানা স্থাপন করতে চাইবে না। ফলে দেখা যায় যে, উত্তরাঞ্চলে শিল্পায়ন হচ্ছে না।

আইনের শাসন ও জবাবদিহিতার অভাব

আইনের শাসন ও জবাবদিহিতার অভাব শিল্পায়নের ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা। কাজ না করে পারিশ্রমিক নেয়া, টেন্ডারবাজি, সরকারি সম্পত্তি দখল ও আত্মসাত, মারামারি, সংঘর্ষের মত বেআইনী কর্মকান্ড সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়মে পরিনত হয়েছে। এগুলোর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। নেই কোন জবাবদিহিতার বালাই। দেশের শাসন ব্যবস্থায় কোন জবাবদিহিতা নেই সারাদেশে অবাধে চলছে চাঁদাবাজি, মাস্তানী, লুট-পাট, জঙ্গিবাদ, দুর্নীতি, খুন-খারাবি, নির্যাতন, দখল যার জন্য কোন বিচার হয় না। কাউকে এর জন্য জবাবদিহিও করতে হয় না। মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ঘুষের অভিযোগ উঠলো, সাংসদের বিরুদ্ধে সরকারী জমি দখলের অভিযোগ উঠলো, কিন্তু কোনও তদন্ত হয়নি, বিচার ও হয়নি।

সরকারের বিভিন্ন সংস্থায় দূর্নীতির ঘুষের জরিপ ভিত্তিক রিপোর্ট দিয়েছে একটি প্রভাবশালী দেশের কুটনীতিক, একাধিক প্রভাবশালী দেশের প্রতিনিধিরা আইন শৃংখলার ভয়াবহতার কথা বলেছেন, আশংকা প্রকাশ করেছেন, এমন কি এদেশে তাদের নাগরিকদের সাবধানে চলাচল করতে বলেছেন। বৃটিশ হাইকমিশনারের উপর গ্রেনেট হামলা, সাবেক অর্থমন্ত্রী ও জাতিসংঘের কর্মকর্তা শাহ্ এম.এস. কিবরিয়াকে মেরে ফেলা হয়, ২১ আগষ্ট বিরোধী দলের জনসভায় গ্রেনেট নিক্ষেপ এবং দেশব্যাপি উগ্র জঙ্গীবাদ সৃষ্টি এগুলোর সঠিক তদন্ত আন্তর্জাতিক চাপেও সরকারের আন্তরিকতা দেখা যাচ্ছে না। দেশের শাসন ব্যবস্থার এরকম দূর্ব্যবস্থায় আর যাই হোক শিল্পায়ন সম্ভব নয়।

ভ্রান্ড় রাজস্ব নীতি

উদার আমদানি নীতি, পরোক্ষ করের উপর অতি নির্ভরশীলতা (রাজস্ব আয়ের প্রায় ৮০%-৯০%), দেশীয় শিল্প সংরক্ষণ নীতির অনুপস্থিতি ইত্যাদি কারণে দেশীয় বাজার সম্প্রসারিত হচ্ছে না, দেশী পণ্য বিদেশী পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না। ফলে সার্বিকভাবে শিল্পায়ন ব্যাহত হচ্ছে।

বিপনন সমস্যা

এই অঞ্চলের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বিপনন একটি অন্যতম সমস্যা। একেতো গ্যাস না থাকায় উৎপাদন খরচ বেশী হয়, অন্য দিকে ভারত থেকে চোরাচালানের মাধ্যমে কম মূল্যে আসা পণ্য এ অঞ্চলের শিল্পের উৎপাদিত পণ্যের বিপননের ক্ষেত্রে বিপর্যয় নিয়ে আসছে।

ভৌগোলিক কারণ

ভৌগোলিক কারণে উত্তরাঞ্চল শিল্পে পশ্চাৎপদ অনেক পূর্ব থেকেই। তবে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর এ সমস্যা আরও প্রকট আকার ধারণ করে। তখন ভারতের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য লেনদেন বন্ধ করা হয়েছিল। ফলে উত্তরাঞ্চলে শিল্পায়নে বাধা সৃষ্টি হয়।

বর্তমানে এই অঞ্চল গুলোতে ভারত থেকে অবৈধ পথে পণ্য এসে বাজার সয়লাব করে দিয়েছে। অবৈধ পথে পণ্য আসার কারণে শুল্ক দিতে হয় না বলে পণ্য গুলো বাজারে কম দামে বিক্রি হয়। যার ফলে স্থানীয় উৎপাদকরা তাদের পণ্য বিক্রি করতে হিমশিম খাচ্ছে। অবস্থা এরকম চলতে থাকলে তাদেরকে উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকবেনা। ইতোমধ্যে অনেক শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে।

পূর্বে যমুনা নদীর কারণে উত্তরাঞ্চল রাজধানী ঢাকা এবং বন্দর নগরী চট্টগ্রাম হতে বিছিন্ন ছিল। ফলে এই অঞ্চলে অবকাঠামোগত দিক থেকে অনেক পিছিয়ে ছিল। যার কারণে এখানে শিল্পায়ন গড়ে উঠতে পারেনি। বর্তমানে বঙ্গবন্ধু সেতু হওয়ার পর অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে।

কৃষি ভিত্তিক শিল্প গড়ে তুলার জন্য কৃষি পণ্য সংরক্ষণের জন্য যে অবকাঠামো দরকার তার যথেষ্ট অভাব এ অঞ্চলে রয়েছে। যার কারণে কৃষি ভিত্তিক শিল্প গড়ে উঠছে না। প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ কৃষি পণ্য নষ্ট হচ্ছে।

উপরোক্ত কারণে শিল্পায়ন সম্ভব হচ্ছে না। উদ্যোক্তারা শিল্পে বিনিয়োগ করতে ভয় পাচ্ছে। ফলে দেখা যায় যে, শিল্প কারখানা বন্ধ করে দিয়ে সেখানে বাড়ি বানিয়ে ভাড়া দেওয়াকে বেশী নিরাপদ মনে করছে।

এছাড়াও আরোও যে সমস্ত সমস্যা শিল্পায়নের ক্ষেত্রে দেখা যায় তা হলো খনিজ সম্পদের অভাব, দক্ষ শ্রমিকের অভাব, কারিগরি জ্ঞানের অভাব, মূলধণী দ্রব্যের অভাব, বৈদেশিক মুদ্রার অভাব, কাঁচামাল রপ্তানির প্রবনতা, দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাব ও রাজনৈতিক স্থিতিশলতার অভাব ইত্যাদি কারণে উত্তরাঞ্চলে তথা আমাদের দেশে শিল্পায়ন হচ্ছে না।

৪। উত্তরাঞ্চলের (সৈয়দপুর) শিল্পায়নের সম্ভাবনা

শিল্পায়নের জন্যে প্রকৃতিগতভাবে বাংলাদেশ এক উজ্জ্বল সম্ভাবনার দেশ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমরা সে সম্ভাবনা কাজে লাগাতে পারিনি। বাংলাদেশ সমতলভূমির দেশ। এখানকার প্রায় ৯০% এলাকা সমতল। আমাদের দেশ ৪টি শক্তিশালী নদী প্রণালী দ্বারা বিধৌত। দেশের দক্ষিণ সীমান্ত সম্পূর্ণরূপে সাগর-মহাসাগরের দিকে উম্মুক্ত। আমাদের দেশের রাজধানী শহর একেবারে কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। সর্বোপরি আমরা এক প্রজাতির মানুষের জাত-বাঙ্গালি। জাপান, মালয়েশিয়া ও সিংগাপুরের মত দেশগুলো আমাদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত খারাপ অবস্থায় থেকেও তারা তাদের দেশকে শিল্পায়িত করতে পারলো, আর আমরা পারলাম না। জাপানের কোন প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল না। দেশটির প্রায় ৯০% পাহাড়-পর্বতময় এলাকার অন্তর্ভূক্ত। এতদসত্ত্বেও জাপানীরা তাদের ভৌগলিক অবস্থানকে (সাগর মহাসাগরের তীরে অবস্থান) কাজে লাগিয়ে অন্যদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ (সোভিয়েত ইউনিয়নের বন, ইউরোপের লৌহ, এশিয়ার তেল ও কয়লা ইত্যাদি) ব্যবহার করে দেশে মৌলিক ভারী শিল্প গড়ে তুলে ছিল, দেশকে শিল্পায়িত করেছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পৃথিবীতে পরিবহনের ক্ষেত্রে জলপথ সবচেয়ে সস্তা। কারণ জলের জন্যে কোন দাম দিতে হয় না। সিংগাপুর সম্পূর্ণরূপে অন্যদেশের সম্পদকে ব্যবহার করে দেশকে শিল্পায়িত করেছে। মালয়েশিয়া ঐপনিবেশিক শাসন ও শোষণ সত্ত্বেও স্বাধীনতার পর সঠিক নীতি-পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে দেশকে শিল্পায়িত করতে সক্ষম হয়েছে।

গবেষণা এলাকা পর্যালোচনা করে আমরা নিম্নোক্ত সম্ভাবনাগুলো চিহ্নিত করতে পারিঃ

উত্তরের শিল্পে সম্ভাবনাময় স্থান হচ্ছে সৈয়দপুর জনপদ। কারণ এখানে রয়েছে দক্ষ-আধাদক্ষ জনশক্তি, সস্তা শ্রম, শিল্পের কাঁচামাল, সড়ক, রেল ও বিমান পথের সুবিধা, ইপিজেড এবং শিল্প উপকরণের সহজলভ্যতা। ফলে শিল্প বিকশিত হওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে এ কথা বলা যায় নিঃসন্দেহে। বৃটিশ উপনিবেশ আমলে ভৌগলিক অবস্থাকে বিবেচনা করে ১৮৭০ সালে সৈয়দপুরে গড়ে ওঠে রেলওয়ে কারখানা। ১১০ একর জায়গার উপর এ বিশাল কারখানাটি উপমহাদেশের একটি প্রাচীন ঐতিহ্যের স্বাক্ষর। প্রতিবেশী দেশ ভারতে রেল সেবাকে জনগনের অন্যতম পরিবহন মাধ্যম হিসেবে অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করা হলেও বাংলাদেশে এর গুরুত্ব কমছে প্রথমে একটি লোকসেড থেকে ওই কারখানার যাত্রা শুরু হলেও গুরুত্বের নিরিখে এর ব্যাপ্তি ঘটতে থাকে। মূলতঃ কারখানায় গড়ে ওঠা দক্ষতার ভিত্তিতেই সৈয়দপুরে শিল্প বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হতে থাকে। রেলওয়ে কারখানার শ্রমিকদের মননশীলতাকে পুঁজি করে এ জনপদে অনেকগুলো লৌহজাত শিল্প গড়ে ওঠে। যা আমাদের

দেশের শিল্পায়নের জন্য খুবই গুরুত্ব পূর্ণ। লৌহজাত শিল্পের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে আমাদের দেশে।

সৈয়দপুরে শিল্পায়ন সম্ভাবনার উজ্জ্বল দিক হচ্ছে সৈয়দপুর বিমানবন্দর। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সৈয়দপুর বিমান বন্দরটি এখানে নির্মাণ হয়। পাক হানাদার বাহিনীর যুদ্ধের মরনাস্ত্র ও রসদ আনা-নেওয়ার জন্য বিমান বন্দরটি নির্মিত হয়েছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই বিমান বন্দরের মাধ্যমে যুদ্ধ বিধ্বস্ত মানুষের সহায়তা করার জন্য বিদেশ থেকে রিলিফ আনা হতো। ১৯৭৭ সালে বিমান বন্দরটি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে যাত্রা শুরু করে। দেশের বিভিন্ন স্থানে পরবর্তীতে বিমান বন্দর স্থাপন হলেও সেগুলো গরুচারণ ভূমিতে পরিনত হয়েছে। কিন্তু সৈয়দপুর বিমান বন্দর বীরদর্পে আজও টিকে আছে। সৈয়দপুর বিমান বন্দরে ৬ হাজার ফুট রানওয়ে রয়েছে ফলে অল্প কিছু উন্নয়ন করেই এ বিমান বন্দরটিকে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে রূপান্তর করা যাবে। সম্প্রতি জাপানের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান উত্তরাঞ্চলের একটি বিমান বন্দরে আন্তর্জতিক কার্গো সার্ভিস চালু করতে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ২০০৫ সালের ১৭ জুলাই সরকারের উচ্চ পর্যায়ে জাপানি কর্তৃপক্ষ তাদের আগ্রহের কথা জানায়। এর ফলে সৈয়দপুর বিমান বন্দর আন্তর্জাতিক হওয়ার সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ইতিপূর্বে সৈয়দপুর বিমান বন্দরটিকে আন্তর্জাতিক করার জন্য সিভিল অ্যাভিয়েশন কর্তৃপক্ষ কাজ শুরু করেছিল। কিন্তু সেই প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। সৈয়দপুর বিমান বন্দর হতে নেপাল ও ভুটানের দূরুত্ব খুবই কম ফলে বিমান বন্দরটিকে আন্তর্জাতিক কার্গো সার্ভিস চালু করে নেপাল ও ভুটানে চাহিদা আছে এমন পণ্য তৈরির কারখানা সৈয়দপুরে স্থাপন করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে উৎপাদন খরচ কম হবে এবং পণ্য রপ্তানিতে সময় কম লাগবে।

সৈয়দপুরে শিল্পায়নের সম্ভাবনার আরো একটি উজ্জ্বল দিক হচ্ছে উত্তরা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা। উত্তরা ইপিজেড-এ অনুসন্ধানে গিয়ে জানা যায় যে, ইহা নীলফামারী শহর থেকে প্রায় ৭ কিলোমিটার এবং সৈয়দপুর বিমান বন্দর হতে প্রায় ১৮ কিলোমিটার দূরে সংগলশী ইউনিয়ন, নীলফামারী জেলাতে অবস্থিত। উত্তরা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা ২০০১ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করেন। গোটা ইপিজেডে ১৫৫টি শিল্প প্লট আছে, এর মধ্যে ৬৬টি প্লট সম্পূর্ণ প্রস্তুত করা হয়েছে এবং একটি কারখানা চালু রয়েছে। ইপিজেডের আয়তন ২৩০.২১ একক। পরিকল্পিত স্ট্রান্ডর্ড ফ্যাক্টরি বিল্ডিংয়ের আয়তন ১৮০০০ বর্গমিটার, ইউটিলিটি সার্ভিসেস-পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিযোগাযোগ, প্রস্তুতকৃত কারখানা ভবনের প্রতি বর্গমিটারের মালিক ভাড়া ১.২৫ মার্কিন ডলার এবং প্রতি বর্গমিটার রেডিমেড প্লটের বার্ষিক ভাড়া মাত্র ১ মার্কিন ডলার। যা দেশের অন্যান্য ইপিজেডের তুলনায় প্রায় অর্ধেক। এছাড়া উন্নত যোগযোগ ব্যবস্থা, শ্রমিকদের কম মজুরি এবং নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ এ ইপিজেডে বিনিয়োগের জন্য সহায়ক। প্রায় ৫ বছরে ইপিজেডে চালু হওয়া একমাত্র হংকং ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান উত্তরা সোয়াটার কারখানা। তবে কর্তৃপক্ষ বলছে, শিগগিরই ভারত-বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগের বৈদ্যুতিক ক্যাপাসিটর তৈরির 'ক্যাপরিক ইলেক্ট্রনিক্স' সহ আরো দু'টি প্রতিষ্ঠান চালু হবে। ক্যাপারিক ইলেক্ট্রনিক্স কারখানার ৪ হাজার বর্গমিটার জায়গায় অবকাঠামো নির্মাণ শেষে ভেতরে যন্ত্রপাতি বসানোর কাজও শেষ হয়েছে। এছাড়া আরও পাঁচটি শিল্প ইউনিট স্থাপণের কাজ চলছে। যে ছয়টি প্লট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে তার একটি নিয়েছে উত্তরা সোয়েটার কারখানা। এছাড়া নর্দান পলি, কেপি ইন্টারন্যাশনাল, সানফ্লাওয়ার, কোয়েষ্ট এক্সেসরিস ও মেসার্স ক্যাপরিক ইলেক্ট্রনিক্স একটি করে প্লট বরাদ্দ নিয়েছে। শেষোক্ত পাঁচটি প্লটেই অবকাঠামো নির্মাণের কাজ চলছে। এছাড়া উত্তরা ইপিজেডের সাতটি নিজস্ব ফ্যাক্টরি ভবনের মধ্যে দু'টি ভাড়া হয়েছে এবং পাঁচটি ফ্যাক্টরি ভবন প্রস্তুত

আছে। যে কোন উদ্যোক্তা চাইলে প্রাথমিক ভাবে ভবন ভাড়া নিয়ে উৎপাদনে যেতে পারে। বিনিয়োগকারীদের প্রচুর সুবিধা দেওয়া হচ্ছে এখানে। উদ্যোক্তাদের জন্য শিল্প প্লট ও কারখানা ভবনের ভাড়া ৫০ শতাংশ হ্রাস করা হয়েছে। এরই মধ্যে আরো কিছু ট্যারিফ সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। যা বৈদেশিক ও স্থানীয় বিনিয়োগকে উৎসাহিত করবে বলে আশা করা যায়। সামগ্রিক দিক বিবেচনায় উত্তরা ইপিজেড গার্মেন্টস ও কৃষি ভিত্তিক শিল্পের জন্য সবচেয়ে সম্ভাবনাময়। কারণ এখানে রয়েছে দক্ষ শ্রমিক এবং দেশের অন্যান্য স্থানের চেয়ে এ অঞ্চলে শ্রমিকদের মজুরি ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ কম। দেশী বা স্থানীয় উদ্যোক্তাদের জন্য আরো কিছু ছাড় দেওয়া হলে এবং স্বল্প সুদে ঋণ সহায়তা বাড়ানো হলে উত্তরা ইপিজেডের এই সমস্ত সুবিধা কাজে লাগিয়ে খুব দ্রুত শিল্পায়ন ঘটানো সম্ভব।

বাংলাদেশের ইপিজেডগুলোতে বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কারণ এখানে শ্রমিকের মজুরি খুবই কম। টেবিল নং ৭-এ বাংলাদেশে ইপিজেডে কর্মরত শ্রমিকদের মজুরি এবং কিছু নির্ধারিত শিল্পোন্নত দেশ সমূহের ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে শ্রমিকদের মজুরি দেখলে ব্যাপারটি সহজ হবে।

টেবিল - ৭ হতে দেখা যায়, শিল্পোন্নত দেশ সমূহের শ্রমিকদের মজুরির তুলনায় বাংলাদেশের ইপিজেডে শ্রমিকের মজুরি কত কম। ফলে শিল্পোন্নত দেশ সমূহের উদ্যোক্তাগন আমাদের ইপিজেড গুলোতে উৎপাদন করলে তাদের উৎপাদন খরচ অনেক কম হবে। আর উত্তরা ইপিজেডে শ্রমিকের মজুরি আরো কম। ফলে এখানে বিনিয়োগর সম্ভাবনা আরও বেশি।

সৈয়দপুরে শিল্পের সম্ভাবনা আছে ও শিল্পায়ন ঘটানো যে সম্ভব তা বিসিক শিল্পনগরী, সৈয়দপুর, নীলফামারী পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়। দেশের বেশির ভাগ বিসিক শিল্পনগরী যেখানে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে সেখানে সৈয়দপুর বিসিক শিল্পনগরীর প্লটের সংখ্যার চেয়ে উদ্যোক্তার সংখ্যা বেশী (স্থানীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা-দাগ)। সৈয়দপুরে শিল্পায়নে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা থাকার পরও উদ্যোক্তরা বিনিয়োগে এগিয়ে আসছে (টেবিল - ৮) যা অত্যন্ত আশার কথা।

টেবিল- ৮ হতে বিসিক শিল্প নগরী সৈয়দপুর নীলফামারীর ভালো অবস্থান নির্দেশ করে।উপজেলা পর্যায়ে এটা অন্যান্য বিসিক শিল্পনগরীর তুলনায় অবশ্যই ভাল।

বাংলাদেশে সম্ভাবনাময় একটি রপ্তানিমুখি শিল্প হচ্ছে গার্মেন্টস তথা তৈরী পোশাক শিল্প। সৈয়দপুর শহরের অলিতে-গলিতে এখন এই শিল্পটি তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে। এতে স্থানীয়ভাবে এখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ঘটছে। কিন্তু ব্যাপক অর্থে বিনিয়োগের কোন সুযোগ আসেনি। তাই পরিসর বাড়ছেনা শিল্পটির। অথচ ভিনদেশ ভারতের বেশ কিছু এলাকা, নেপাল ও ভুটানে সৈয়দপুরে উৎপাদিত ট্রাউজার, মোবাইল প্যান্ট, জ্যাকেটসহ অন্যান্য গার্মেন্টস পণ্যের রয়েছে ব্যাপক চাহিদা। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা লেটার অব ক্রেডিট (এল.সি.) খুলে সেদেশে সৈয়দপুরের গার্মেন্টস পণ্য আমদানি করছে (স্থানীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা দাগ)। এটা নিঃসন্দেহে এ জনপদের মানুষের জন্য গর্বের বিষয়।

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি ও এর উপর ভিত্তি করে ৩০০ মেঘাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন হওয়ায় এ অঞ্চল গুলিতে শিল্পায়নের নতুন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কারণ এই অঞ্চলের শিল্পায়নের অন্যতম বাধা ছিল জ্বালানী ও বিদ্যুৎ। এছাড়াও ফুলবাড়ি কয়লা খনিতে কয়লার বিশাল মজুদ আছে তা অর্থনৈতিক ভাবে লাভজনক ও পরিবশের কথা মাথায় রেখে উত্তোলন করতে পারলে এ অঞ্চলে জ্বালানী সমস্যা

টেবিল ৭ : বাংলাদেশ ইপিজেডে কর্মরত শ্রমিকদের মজুরি এবং কিছু নির্ধারিত শিল্পোন্নত দেশ সমূহের ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে শ্রমিকদের মজুরি

(মার্কিন ডলার)

দেশ	ম্যানুফ্যাকচারিং এ কর্মরত শ্রমিকদের ঘন্টায় গড় আয় (মার্কিন ডলারে)
বাংলাদেশ ইপিজেড	০.৪২
জার্মানি	২১.৫৪
যুক্তরাজ্য	২২.৪৫
যুক্তরাষ্ট্র	১৯.২৪
জাপান	২৬.৩৪

উৎসঃ বেপজা এবং আই.এল.ও (২০০৩)

সমাধান হবে ।

অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, পাকিস্তানী ঔপনিবেশ আমলে ১৯৬৬ সালে ভূ-তাত্ত্বিক জরিপে দেখা যায় সৈয়দপুর উপজেলার খাতামধুপুর ইউনিয়নের ভূ-গর্ভসহ, কিশোরগঞ্জ উপজেলার চাঁদখান, বাহাগিলি ও মাগুরা ইউনিয়ন এবং রংপুর জেলার তারাগঞ্জের ইকরচালী ইউনিয়নের অভ্যন্তরে বিপুল পরিমান কয়লার মজুদ রয়েছে । ভূ-তত্ত্ববিদদের তথ্য মতে, অত্যন্ত উন্নতমানের কয়লার মজুদ রয়েছে এই বেসিনে । তখন গবেষকরা বলেছিল যে, এই কয়লা ম্যাচুরিটি হতে ১০ বছর সময় লাগবে কিন্তু আজ ৪০ বছর হয়ে গেলেও খনিটি থেকে পেট্রোবাংলা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কয়লা উত্তোলনের কোন পদক্ষেপ নেয়নি । কয়লা খনিটি থেকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কয়লা উত্তোলন শুরু করে এ অঞ্চলের জ্বালানী সমস্যা সমাধান করে শিল্পায়ন নিঃশ্চিত করা যাবে বলে আমরা আশা করি ।

অনুসন্ধানে আরোও দেখা যায় নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলার বিস্তীর্ন এলাকা জুড়ে রয়েছে সিলিকা বালু, নুড়ি পাথরের অস্তিত্ব । এ সম্পদ আহরণে সরকারের বাস্তবমুখি নীতিমালা থাকলে এ অঞ্চলে কেবল সিলিকা বালু ও নুড়ি পাথরকে ঘিরেই বয়ে আনা যেতে পারে সমৃদ্ধি । যত্রতত্র এর আহরণ

টেবিল ৮ : বিসিক শিল্পনগরী, সৈয়দপুর, নীলফামারী পরিস্থিতি (২০০২-২০০৩ সময়ে)

শিল্পের ধরণ	সংখ্যা		নিয়োজিত জনবল
	চালু	বন্ধ	
১ । খাদ্য ও খাদ্যজাত শিল্প	১৮	২	১৭৪
২ । পাট ও পাটজাত শিল্প	১	৩	৩৩
৩ । বনজ শিল্প	১	৩	৮
৪ । টেনারী, চামড়া ও রাবার শিল্প	১	৩	১০
৫ । রসায়ন ও ঔষধ শিল্প	৪	৩	৮৪
৬ । প্রকৌশল শিল্প	১৩	১	২২২
মোট	৩৮	৩	৫৩১

উৎসঃ শিল্পনগরী পণ্য ডাইরেক্টরী ২০০৩

কোনভাবেই দেশজ অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করতে পারবে না। ফলে প্রয়োজন এই খনিজ সম্পদকে খনিজ মন্ত্রণালয়ের আওতায় দিয়ে ড্রেজিং করে তা উত্তোলন এবং প্রাপ্ত সম্পদের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা। এতে এলাকায় নুড়ি পাথর বা বালু কেন্দ্রিক অসংখ্য শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব বলে আমরা বিশ্বাস করি।

এই অঞ্চলের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো যে অঞ্চলটি বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে অপেক্ষাকৃত শান্ত।

উপরোক্ত সম্ভাবনা গুলিকে কাজে লাগিয়ে এই এলাকায় শিল্পায়ন ঘটানো সম্ভব বলে আমরা বিশ্বাস করি।

৫। সুপারিশমালা

উত্তরবাংলার শিল্পায়নের সমস্যাসমূহের আশু সমাধান করে শিল্পায়নের গতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য আমাদের মতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহন করা আবশ্যকঃ

ক) জ্বালানী সমস্যা সমাধান করতে হবে। উত্তরবাংলার শিল্পায়নে বাধার অন্যতম প্রধান কারণ হলো জ্বালানী সমস্যা। এখানে গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে এবং যত দিন গ্যাস না আসে ততদিন ফার্নেস ওয়েল সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে এবং বিকল্প জ্বালানী ব্যবহারের অনুসন্ধান করতে হবে। একজন বেপজা কর্মকর্তা বলেন যে, উত্তরা ইপিজেডে গ্যাস প্রদান করা গেলে এই মুহূর্তে ৮০টির মত শিল্প কারখানা চালু করা যাবে। বিদেশী বিনিয়োগকারীরা এখানে না আসার কারণ হলো গ্যাস সরবরাহ না থাকা। তাই এই অঞ্চলে জ্বালানী সমস্যার অচিরেই সমাধান এবং নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে।

খ) বিমান বন্দর ও রেলওয়ে কারখানার (রেলপথ) আধুনিকায়ন করতে হবে। সৈয়দপুর বিমান বন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে রূপান্তরিত করতে হবে যা শিল্পায়নের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানার পুরাতন ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে হবে। রেলপথ গুলোর সংস্কার করতে হবে। ৩৩ বছরে বাংলাদেশে রেল লাইনের দৈর্ঘ্য প্রায় ২০০ কিঃ মিঃ হ্রাস পেয়েছে। ১৯৭২ সালের ২৮৭৪.৩ কিঃ মিঃ থেকে ২০০৩ সালে ২৬৬৮ কিঃ মিঃ এসে দাঁড়িয়েছে। আশ্চর্যজনকই বটে। দুনিয়ার সকল শিল্পায়িত দেশে উন্নয়নের সাথে সাথে রেল লাইনের দৈর্ঘ্য বছরের পর বছর বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ স্থলপথের মধ্যে রেলপথ হচ্ছে সবচেয়ে সস্তা, নির্ভরযোগ্য ও দ্রুত। কাজেই শিল্পায়নের প্রক্রিয়ায় রেল পথের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। আর সম্ভবত বিদেশী বিনিয়োগকারীরা সেকারণেই বলতে শুরু করেছেন যে, বংলাদেশে ব্যবসার খরচ বেশী। তবে অবশ্য বঙ্গবন্ধু সেতু হওয়ার পর কিছু নতুন রেল লাইন সংযোজিত হয়েছে। নীলফামারীর চিলাহাটিকে স্থলবন্দরে রূপান্তর করতে হবে এক্ষেত্রে ১৯৯৯ সালে নেওয়া পদক্ষেপ অনুযায়ী বাংলাদেশ অংশে ৮.১০ কিলোমিটার ও ভারতীয় অংশে ৩.২৪ কিলোমিটার পরিত্যক্ত রেলপথ ঠিকঠাক করার পরিকল্পনাকে কার্যকর করতে হবে।

গ) সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করতে হবে। এ এলাকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিমালিকানায় যে সমস্ত শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে তা অনেক সমস্যায় জর্জরিত। তাই সমস্যাগুলো দূর করার জন্য সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে।

ঘ) উত্তরা ইপিজেডের উন্নয়নে সব ধরণের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে এবং এই ইপিজেডে বিনিয়োগকারীদের যে সমস্ত সুবিধা প্রদান করছে তা জোরেসোড়ে বিদেশে প্রচার করতে হবে।

ঙ) বাংলাদেশের সীমান্তে পাহারা জোরদার করতে হবে। যাতে অবৈধ পথে ভারতীয় পণ্য এদেশে না আসতে পারে।

চ) শিল্প ঋণ সুবিধা প্রদান করতে হবে এবং শিল্প ঋণ যেন অন্য খাতে ব্যবহৃত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কমাতে হবে, পুঁজি ও দীর্ঘ মেয়াদি মূলধন প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দিতে হবে এবং ইকুইটির হার কমাতে হবে।

একটি সুদূর প্রসারী, সুষ্ঠ ও ভারসাম্যপূর্ণ শিল্পনীতি প্রণয়ন করতে হবে।

ছ) ঢেলে সাজাতে হবে রাজস্ব ও ব্যাংকিং নীতিকে। পরোক্ষ করের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করে প্রত্যক্ষ কর থেকে রাজস্ব আয় বাড়াতে হবে। সরকারের রাজস্ব ও ব্যাংকিং নীতি অবশ্যই শিল্পায়নের সহায়ক হতে হবে।

জ) শান্তি ও উন্নয়ন সমার্থক শব্দ। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হলে শিল্পায়ন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কোনটাই হবে না। সরকারকে এটা অনুধাবন করতে হবে। অতএব শান্তি প্রতিষ্ঠায় সরকারকে সৎ, আন্তরিক ও উদ্যোগী হতে হবে।

ঝ) আইনের শাসন ও জবাবদিহিতার বিষয়টি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভ না করলে প্রথম দু'টি কখনই বাস্তবায়িত হবে না। সরকারকে এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে উপলব্ধি করতে হবে। ভারত, মালয়েশিয়া, সিংগাপুরের মত দেশগুলোতে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভ করায় শিল্পায়নসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে।

ঞ) শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজন দক্ষ জনশক্তি। আর দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে হলে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। স্বল্প সময়ের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করতে হবে। কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। সম্ভব হলে প্রত্যেকটি ইউনিয়নে একটি করে বহুমুখী কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। ভাষা শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। শুধু ইংরেজীর উপর গুরুত্ব দিলেই হবে না। বিশ্বের প্রধান ভাষাগুলোর উপর বিশ্ববিদ্যালয় ও সম্ভব হলে কলেজগুলোতে সন্ধ্যাকালীন কোর্স চালু করতে হবে। বাজেটে সকল ধরণের অপ্রয়োজনীয় ও অনুৎপাদনশীল ব্যয় হ্রাস করে শিক্ষাখাতের ব্যয় বৃদ্ধি করা উচিত।

ট) এ অঞ্চলে কৃষি ভিত্তিক শিল্প গড়ে উঠার অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু প্রতিবছর দেখা যায় কৃষি পণ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় অনেক শস্য নষ্ট হয়। তাই কৃষি পণ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা যদি করা যেত তাহলে অনেক শস্য রক্ষা করা যেত এবং এর উপর ভিত্তি করে অনেক শিল্প কারখানা

গড়ে তোলা যেত। তাই কৃষি পণ্য সংরক্ষণের জন্য চাহিদা অনুযায়ি হিমাগার তৈরি করতে হবে।

উপরোক্ত সুপারিশ গুলো যদি যথাযথ ভাবে বাস্তবায়িত করা হয়, তাহলে উত্তরবাংলায় শিল্পায়ন ঘটানো সম্ভব হবে বলে আমরা মনে করি।

৬। *উপসংহার*

বাংলাদেশ দু'বার ঔপনিবেশিক শোষনের শিকার হয়েছিলঃ প্রথমবার বৃটিশদের ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ সালের আগষ্ট পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়বার ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানী নব্য ঔপনিবেশিকদের। ঔপনিবেশিক শাসনামলে তাদের অবহেলা ও শোষণের কারণে আমাদের এ অঞ্চলে তেমন কোন শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেতে পারেনি। তারা যেটুকু করেছিল সবই তাদের শাসন ও শোষনকে চিরস্থায়ী করার স্বার্থে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা এই অঞ্চলকে শিল্পের কাঁচামাল ও বাজার হিসাবে ব্যবহার করেছে মাত্র। ফলে আমাদের শিল্পের যে অপূর্ণনীয় ক্ষতি হয়েছে তা আমাদের আজও বহন করতে হচ্ছে। একমাত্র স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সাল থেকেই প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশের শিল্পায়নের উপর নজর দেওয়া হয়। বাংলাদেশের শিল্পায়নে প্রথম দিকে রাষ্ট্রীয়করণের উপর বেশি জোড় দেওয়া হয় পরবর্তীতে অবশ্য বিরাষ্ট্রীয়করণের উপর জোড় দেওয়া হয়। যা আমরা ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকারি ও বেসরকারি বরাদ্দ দেখলে বুঝতে পারি। সরকারি খাতের বরাদ্দ পাঁচটি পরিকল্পনায় যথাক্রমে ৮৮.৭১%, ৮৪.৪৬%, ৬৪.৫৩%, ৬৪.৭৭%, ৫৫.৯৭% এবং ৪৩.৮৩%। বে-সরকারি খাতের বরাদ্দ যথাক্রমে ১১.১৯%, ১৫.৫৪%, ৩৫.৪৭%, ৩৫.২৩%, ৪৪.০৩%, এবং ৫৬.১৭%।

বাংলাদেশের অর্থনীতি এখনো কৃষিভিত্তিক। ১৯৭২-৭৩ সালে মোট জাতীয় উৎপাদনে কৃষি ও শিল্পের অবদান ছিল যথাক্রমে ৫০ শতাংশ ও ১৪ শতাংশ। ২০০৭-০৮ সালে মোট জাতীয় উৎপাদনে কৃষি ও শিল্পের অবদান ছিল যথাক্রমে ২০.৮ শতাংশ ও ১৭.৮ শতাংশ। ফলে দেখা যায় যে, কৃষির অবদান যেখানে ২৯.২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে সেখানে শিল্পের অবদান বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ৩.৮ শতাংশ। তাই বলা যায় যে, আমরা স্বাধীনতার ৩৮ বছরেও শিল্পের ভিত মজবুত করতে পারিনি। শিল্পের জন্য কার্যকর নীতিমালা এখনও আমরা রচিত করতে পারিনি। আমাদের দেশের মৌলিক ভারী শিল্পের অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। আমরা কেবল মাত্র তৈরি পোষাক শিল্পের উন্নয়ন ঘটাতে পেরেছি। এ শিল্পেরও অনেক সমস্যা রয়েছে। আমাদের পাট শিল্পকে দিনে দিনে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো আদমজী পাটকল সাম্রাজ্যবাদীদের কথায় বন্ধ করে দেওয়া। তাদের কথাতেই রাষ্ট্রীয় খাতের শিল্পগুলো আমাদের দেশে অবহেলার শিকার হচ্ছে। ফলে রুগ্ন হচ্ছে ভারী শিল্প গুলো। যা শিল্পায়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। অপর দিকে আমরা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পেরও তেমন কোন উন্নয়ন ঘটাতে পারছিনা। আমাদের রপ্তানির তুলনায় আমদানি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমাদের অর্থনীতি। তবে অবশ্য বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শিল্পায়ন একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া। এর সাথে অনেক বিষয় জড়িত থাকে। এর সাথে শিক্ষা, কৃষি, পরিবহনসহ অনেক খাতের সমান্তরাল বিকাশের প্রশ্ন জড়িত। কাজেই শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজন সুসমন্বিত, সুপরিকল্পিত ও ভারসাম্যপূর্ণ পদক্ষেপ। বিচ্ছিন্ন কোন পদক্ষেপে কাজ হবে না। এটা

আমাদের নীতিনির্ধারকরা যত দ্রুত উপলব্ধি করবেন ততই শিল্পায়নের কাজটি এগিয়ে নেয়া সহজ হবে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষ গ্রন্থ সমূহ।

২। অর্থমন্ত্রণালয় কতৃক প্রকাশিত অর্থনৈতিক সমীক্ষা সমূহ।

৩। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৪, ও ২০০৮ বাংলাদেশ ব্যাংক।

৪। বেপজা কর্তৃক প্রকাশিত বুলেটিন সমূহ।

৫। প্রফেসর ডঃ মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান - এর "বাংলাদেশের শিল্পায়নঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা", *Bangladesh Journal of Political Economy,* Volume 18 Number -1, June-2003.

৬। হোসেন মোহাম্মদ মোফাজ্জল- এর থিসিস (চয.উ) "Population Grougth, Industrialization and Urbanization in the Northern Region of Bangladesh."

৭। আ. স. ম. রেজাউল হাসান করিম বক্সী- এর "Performance of export processing zones in Bangladesh: An overview." *Bangladesh Economic Studies*, Volume-11, July 2005.

৮। The first five year plan 1973-78.

৯। The second five year plan 1980-85.

১০। The third five year plan 1985-90.

১১। The fourth five year plan 1990-95.

১২। The fifth five year plan 1998-2002.

১৩। দৈনিক প্রথম আলো।

১৪। দৈনিক সমকাল।

১৫। দৈনিক সংবাদ।

১৬। দৈনিক যুগান্তর।

১৭। সাপ্তাহিক স্থানীয় পত্রিকা দাগ।

ইন্টারনেট।